বিখ্যাত মার্ডার কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৭
জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি, পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

মুদ্রক
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা-৬

কল্যাণবর প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

ও

কল্যাণীয়া তপতী চট্টোপাধ্যায়

যুগলেষু

ভূমিকা

ক্রাইম ক্রাইমই। দেশ কাল ভেদে তার চরিত্র একই প্রকার। তবু তারি মধ্যে বেশ কিছু বৈচিত্রের আস্বাদ আছে বৈকি। বিভিন্ন দেশ, বিচিত্র মানুষ, আলাদা আলাদা সামাজিক ব্যবস্থা। ককেশিয়ান, নিগ্রয়েড, মঙ্গোলিয়ান, নর-নারী অধ্যুষিত এই বিশ্বের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও আবহাওয়া ঘটিত আকৃতি কারুর সঙ্গে কারুর বড় একটা মেলে না। সভ্যতার অগ্রগতিতে এবং বৈজ্ঞানিক চরম উন্নতীর মাধ্যমে ক্রাইমের চেহারা ও গোত্র সবই গেছে পালটে এক এক দেশে। তাই এ গ্রন্থে সংকলিত প্রধান প্রধান ষোল সতেরটি দেশের রাজধানীতে সংঘটিত অপরাধসমূহ দৃষ্টে কত রঙ, কত ভাষা, কত নতুনত্বের চমকেই না বিস্মিত হতে হয়। দেশ ভেদে এক একটি ঘটনা এক এক ধরণের শংকা শিহরে রোমাঞ্চিত করে। এ গ্রন্থের অপর বৈশিষ্ট হল বিশ্বের বিভিন্ন প্রধান প্রধান নগরে ঘটিত কুখ্যাততম অপরাধ কাহিনীগুলি সেই সেই স্থানের অন্যতম পুলিশ প্রধানদের জবানীতেই বিবৃত হয়েছে।

পরিশেষে জানাই, এ গ্রন্থ প্রকাশে তরুণ প্রকাশক শ্রীমান সমীরকুমার নাথএর তৎপরতা প্রকৃতই প্রশংসার্হ।

বীরু চট্টোপাধ্যায়

গল্পক্রম

লেখকের অন্যান্য বই

অ্যানা পিটারসন ও আমি
সেই মেয়েটি ও কাপ্তলারদের কাহিনী
সুন্দরীদের দ্বীপ
নীল প্রতিহিংসা
ফিয়র্ড দেশের মেয়ে
অবৈধ পাপ ও প্রমীলা সংবাদ
মানুষ যখন পশু হয়
নায়ক আমি
পঞ্চম তরঙ্গ
অপরাধ দেশে দেশে
বিস্ময়কর বহুরূপী
দানব পাখির আজব কাহিনী
বিখ্যাত ভৌতিক কাহিনী
বিখ্যাত জলদস্যু কাহিনী
রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী
মানুষ খেকোর কবলে
পঙ্কিল প্রণয়
বিবশ শর্বরী
চারমূর্তি (নাট্যরূপ)
পরিবর্তন („)

হাস্যরত খুনী

(লণ্ডন)

নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জ্যাক হেনরী বললেন ঃ

পুলিসের পক্ষে এই নাটকের গৌরচন্দ্রিকা শুরু হয়েছিল মাঝ রাতের কিছু পরে। যখন লণ্ডনের উপকণ্ঠের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে এবং মাইলের পর মাইল রাস্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নির্জন হয়ে উঠেছে সে সময়ে শুরু। ১৪ই জুলাইয়ের সে রাতে কিংস্টন ব্রিগেডের ফায়ারম্যান জন উইলিয়াম লাভ গাড়ি করে সমারসেট রোড দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। গাড়ির হেড লাইটে রাস্তায় কালো একটা কি বস্তু পড়ে আছে নজরে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিল রাস্তার পাশে ঘাসের কাছে একটা কাটা গাছ বোধকরি পড়ে আছে। কিন্তু কাছে আসতে চমকে দেখে একটা দেহ পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক করে গাড়ি থামিয়ে সে নেমে গেল।

কাছে গিয়ে দেখল ভয়ঙ্কর ভাবে থেঁতলানো মস্তক এক রমণীর দেহ পড়ে আছে। প্রাণহীন বীভৎস শব। লাভ ফের গাড়িতে উঠে সাহায্যের জন্য এগিয়ে চলল। আধমাইল সামনে ছুটো পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, নিকটবর্তী কোন বাড়ির একটা চুরির কেস তদন্তে তারা এসেছে। দুজন অফিসার লাভের সঙ্গে সমারসেট রোডে চলে যায়। তাদের মধ্যে একজন আমাকে ফোন করে। আমি তখন শুয়ে পড়েছিলাম। কালবিলম্ব না করে উঠে পড়ি এবং রেডিও গাড়ি করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই।

কালো পোষাক পরা নিহতা রমণীকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় কোন অসতর্ক ড্রাইভার চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। দেহটা চিৎ অবস্থায় ছিল। মাথাটা ঘাসবনের কাছে, দেহটা রাস্তার উপরে। মাথা এবং মুখ ভয়ঙ্কর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, অধিকাংশই মুখের বাঁ দিকে।

পায়েও বহু কাটা ছেঁড়ার দাগ। ডান পায়ের উপর মোটর টায়ারের ছাপ।

অপরিচিত রমণী সম্পূর্ণ পোষাকে আবৃত ছিল। মাথায় কোন টুপী ছিল না আর হ্যাণ্ডব্যাগের কোন চিহ্ন নেই। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় মহিলাটি রক্তক্ষরণের ফলেই মারা গেছে। অপরাপর চিহ্ন দেখে সহজেই বোঝা যায় এখানে তার মৃত্যু হয়নি। অন্য কোথাও মেরে এনে রাস্তায় ফেলে মৃতদেহের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে ঘটনার পরিণতিতে বোঝা গেছে যে অসতর্ক খুনী এসব সম্ভাবনার কথা উপেক্ষা করেছিল।

প্রথম কাজ হল সনাক্তকরণ। কিন্তু আশি নব্বুই লক্ষ মানুষের নগরীতে কোন কিছু সূত্রহীনভাবে সে কাজ আদৌ সহজসাধ্য নয়। আমরা মৃতদেহের আঙুলের ছাপ নিলাম। এই আশায় যে এর দ্বারা হয়ত সনাক্তকরণে সুবিধে হবে, যদি মেয়েটির কোন পুলিশ রিপোর্ট থেকে থাকে ইতিপূর্বে। চতুর্দিকে তদন্তের জাল ছড়িয়ে দেওয়া হল, সাধারণ গ্যারেজগুলিতে, কফি স্টলে, ট্রান্সপোর্ট কাফে সমূহে। শুধু যে মৃতা রমণীর নামধাম জানার উদ্দেশ্যেই নয়, এমন একটি রক্তমাখা গাড়ি এবং একজন ড্রাইভার যে আহত এবং যার পোষাক পরিচ্ছদ রক্তমাখা, তার সন্ধানেও জাল ছড়ানো হল। মেট্রোপলিটান অঞ্চলের যাবতীয় পেট্রলম্যান ও পয়েণ্টসম্যানদের এমন একজন ড্রাইভারের খোঁজ করতে বলা হল যে এই ঘটনা ও দুর্ঘটনার ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারে।

প্রত্যেকটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনেরই একটা শুরু করবার পয়েন্ট থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা না জানি নিহতার পরিচয়, না জানা আছে কোথায় সে নিহত হয়েছে।

মুখ দেখে যে সনাক্তকরণে সুবিধে হবে তারও উপায় নেই কেননা মহিলার মুখটি পরিপূর্ণভাবে থেঁতলানো। একজন মহিলাকে সন্দেহ করে খোঁজ খবর করতে হতাশ হতে হল, কারণ দেখা গেল সে

জীবিতা।

পরদিন সকালে একদল ডিটেকটিভকে লাগানো হল আশেপাশের মাঠ-ঘাট তল্লাসী করে দেখবার জন্য। যদি মহিলাটির হ্যাণ্ডব্যাগ পাওয়া যায়, তাহলেও ভেতরকার কাগজপত্রে পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। কিংবা এমন কোন বস্তু যা খুন করবার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রভুত সাহায্য করল চীফ কনস্টেবল এবং সুপারিনণ্টেণ্ডেণ্ট। প্রেস এবং বি বি সিও নানাভাবে এই করুণ সংবাদটি প্রকাশ করে এই রহস্যময় হত্যাকাহিনী উন্মোচন করতে সহায়তা করতে লাগল।

সংবাদপত্রে নিহতা রমণীর ফটোগ্রাফ দেখে বহু লোকই সনাক্ত করতে সমর্থ বলে এগিয়ে এল। কিন্তু সব ব্যাপারই বৃথা হতে লাগল। এক সময় মনে হল এটাও বুঝি অনুদ্ঘাটিত রহস্যের এক হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকবে।

ধন্যবাদ প্রেসকে। তাদের প্রচার সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী। অবশেষে নিহতা রমণীর পরিচয় পাওয়া গেল।

মেয়েটির নাম রোজ মারিয়েল অ্যাটকিনস। রোজ আবার 'আইরিশ রোজ' ও 'প্যাট' নামেও পরিচিতা ছিল। সে মৃত্যুকালীন সময়ে বাস করত পুটনি ব্রীজ রোডের এক ফ্ল্যাটে। এ স্থানটি দক্ষিণ পশ্চিম লণ্ডনের উইমবেলডন এলাকায়। মৃতদেহটিও পাওয়া গেছে উক্ত অঞ্চলেই।

অশুভ দিনটিতে রোজ কালো পোষাক তার ওপরে কালো রঙের ফারকোট পরে বেরিয়েছিল। সাদা টুপী ছিল মাথায় আর স্বচ্ছ লেসওয়ালা দস্তানা হাতে। ওর এই পোষাক হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে, কেননা যারা ওকে সেদিন বের হতে দেখেছে প্রত্যেকেই হুবহু এই একই পোশাকের বর্ণনা দিয়েছে। তার ফলে আমরাও ওর গতিবিধি সংগ্রহ করতে সমর্থ হলাম।

বিকেলে সে হাই স্ট্রীটের একটা ক্লাবে গিয়েছিল এবং সেখানে বেলা

পাঁচটা অবধি ছিল। সন্ধ্যে বেলায় সে নাকি তার ফ্ল্যাটেই ছিল। কিন্তু রাত দশটায় তাকে উইমবেলডনের পার্ক সাইডে বাস থেকে নামতে দেখা গেছে।

অবশেষে আমরা এমন একজন তরুণীকে পেলাম যে ওকে রাত সাড়ে এগারোটার সময়ও জীবিত অবস্থায় দেখেছে। বোধকরি নিহত হওয়ার কয়েক মিনিট আগে সেটা। রোজ পার্ক সাইডের ইনার পার্ক রোড়ে দাঁড়িয়েছিল। এই তরুণী রোজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রোজ তার ভালভাবেই চেনা, কথা বলবার জন্যেই এগোচ্ছিল সে। এমন সময় একটা ছোট সবুজ রঙের ভ্যান এসে কাছে দাঁড়াতে, রোজ ড্রাইভারের সঙ্গে কী যেন কথা বলল। তারপর সে ভ্যানে উঠে পড়তে ভ্যান চলতে লাগল সমারসেট রোডের দিকে। সেই ওকে শেষবারের মত দেখা গেছে জীবিত অবস্থায়।

প্রত্যক্ষদর্শীর এই বর্ণনা আমাদের তথ্যানুসন্ধানে এগিয়ে যেতে খুবই সাহায্য করল। এ সংবাদের উপর নির্ভর করেই আমরা হত্যাকারীর সন্ধানে অগ্রসর হবার সুযোগ পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সবুজ রঙের ভ্যানটির জন্য সার্বিক তল্লাসীকার্য শুরু হল। লণ্ডনের যাবতীয় সবুজ ভ্যান ধরে ধরে রক্তের দাগ পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল। রোজের অজস্র বান্ধবী ছিল, তারা সবাই জানালো রোজের নাকি অভ্যেস ছিল ফার কোটের গুপ্ত এক পকেটে করে টাকা-পয়সা নিয়ে চলা-ফেরা করা। প্রায়ই সে তার সহচর বা সহচরীদের ফার কোটটার প্রতি নজর রাখতে বলতো। কখনো কখনো ৩০।৪০ পাউণ্ডও সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। রোজ ছিল তিরিশ বছর বয়স্কা এক বিবাহিতা মহিলা এবং দুটি সন্তানের জননী।

যখন তার মৃতদেহ পাওয়া গেল তখন তার ফার কোটে কোন অর্থ পাওয়া যায় নি আর হ্যাণ্ডব্যাগটা তো বেপাত্তাই ছিল। এতেই বোঝা যায় হত্যার পেছনে অর্থোপহরণই উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের এখন প্রয়োজন সবুজ ভ্যান ও তার ড্রাইভার, একটি সাদা টুপী ও হ্যাণ্ডব্যাগ

খুঁজে বের করা। তল্লাসীকার্য সারা ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল।

অনুসন্ধান কার্য এখন অনেকটা সহজ হয়ে এলেও হাজার হাজার সবুজ ভ্যানের মধ্যে থেকে আসল ভ্যান আর লক্ষ লক্ষ ড্রাইভারের মধ্যে আমাদের প্রার্থীত ড্রাইভারটিকে খুঁজে বের করা বড় সহজসাধ্য মনে হল না।

তবে পুলিস পক্ষের বজ্র আঁটন সম্ভব হল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতের ছাপ বিশারদ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ-ইন্সপেক্টর ফ্রেডারিক চেরিলের কর্মদক্ষতায়। তিনি নিহত রমণীর মোজার ওপরকার একটা ছাপ পরীক্ষা করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে সে ছাপ দেখে কোন ধরণের মোটর টায়ার তার উপর পড়েছিল তা নির্ধারণ করেন। অতঃপর তিনি কতকগুলি মোটর টায়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং অজস্র টায়ারের স্যাম্পেল দেখে অবশেষে রোজের মোজায় যে ধরণের টায়ারের ছাপ পড়েছিল তা বের করে ফেলেন। তাঁর এই অপূর্ব অনুসন্ধান কার্যের ফলে বেরিয়ে যায় যে উক্ত টায়ার লাগে শুধু অস্টীন সেভেন বা মরিস এইট গাড়িতে।

অন্ধকারে খোঁজার মত হাজার হাজার গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষারূপ দুঃসাধ্য কাজকে চেরিল তাঁর অসাধারণ প্রক্রিয়ায় জলের মত সহজ করে আনলেন। পরে সেই খুনী মোটর যখন আবিষ্কার করা হল অবাক হয়ে দেখা গেল সেটি মরিস এইট-ই বটে।

ঘটনা ঘটবার ৩৬ ঘণ্টা বাদে ১৬ই জুলাই বেলা ১১টার সময় ডিভিসনাল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর বিভারিজ আমায় ফোনে জানাল সবুজ গাড়িটা পাওয়া গেছে। অপর একটি কেস তদন্তের মুখে সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্যানক্রাস স্ট্রীটের এক হোলসেল ব্যাপারির ফার্ম পুলিশ স্টেশনে ফোন করে জানায় যে তাদের একজন ড্রাইভার ৩২ পাউণ্ড তহবিল তছরূপ করে পালিয়েছে। তার নাম জর্জ ব্রেইন। সে দক্ষিণ-পশ্চিম লণ্ডনের সেণ্ট জেমস কটেজ এলাকায় পিতামাতার সঙ্গে বসবাস করে।

সবুজ মরিস এইট ভ্যান্‌টা সে অপর একজন সহকর্মীর হয়ে রোজই বাড়ি নিয়ে যেত রাত্তিরে। সকাল থেকে সে বেপাত্তা হয়ে গেছে।

ভ্যানটাকে পরীক্ষা করা হল। যদিও সেটাকে সম্প্রতি ধোয়া-মোছা করা হয়েছে তবু তার মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া গেল। প্যানক্রাস ষ্ট্রীটের ফার্মের গ্যারেজের একটা ডাস্টবিন পরীক্ষা করে সেখানে ছাই হয়ে যাওয়া দগ্ধ কিছু বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। এগুলো এবং ভ্যানটাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অ্যানালিস্টের কাছে পরীক্ষা করবার জন্য পাঠানো হল। গ্যারেজের পাশে এক খুপরী থেকে রোজের হ্যাণ্ডব্যাগও পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল একটা পুরনো লোহার পেছনে মুচীদের ব্যবহৃত একটি ছুরি এবং একখানা কম্বল উভয়ই রক্তমাখা।

হত্যা রহস্য অনেকটা প্রায় সহজ হয়ে এল। আমি উপস্থিত হলাম ব্রেইনের বাড়িতে। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তবে এ সংবাদটি সংগ্রহ করতে পারলাম যে খুনের রাত্রে ১২-৩০ পর্যন্ত সে ভ্যানটিকে নিয়ে বাইরে ছিল। সে বাড়ি ফিরে মাকে বলে, ভ্যানটা রাস্তায় খারাপ হয়ে গেছে। মা লক্ষ্য করল যে তার ছেলে অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ ও চিন্তান্বিত হয়ে গেছে। তার স্বভাবে যেটা বেমানান।

এখন কাজ হল ব্রেইনকে পাকড়াও করা। কিন্তু শনিবার সকাল আটটা থেকে সে বেপাত্তা হয়ে গেছে। কোম্পানীর হয়ে আদায়ীকৃত ৩২ পাউণ্ড সে অফিসে জমা দেয়নি। সে অফিসে বলেছে টাকাটা নাকি সে বাড়িতে ফেলে এসেছে। তাতে ফার্ম জানিয়েছে যদি সোমবারের মধ্যে সে উক্ত ৩২ পাউণ্ড জমা না দেয় তো তার বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ করা হবে। প্রথমে সেণ্ট মার্গারেট্ রোডের বাসিন্দা ওর সহকর্মী ড্রাইভার উইলিয়াম আর্থার ফ্রস্টকে টাকাটা আনবার জন্য শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রেইনের সঙ্গে তার বাড়িতে পাঠিয়েছিল অফিস।

শনিবার সকাল ৭-১৫তে ব্রেইন গিয়ে উপস্থিত হয় ফ্রস্টের বাড়িতে। এবং স্বীকার করে তার হাতে এখন উক্ত টাকাটা নেই। ফার্মের

নির্দেশ অনুসারে রোজই সে ফ্রস্টকে বাড়ি থেকে তুলে অফিসে নিয়ে যেত।

ধীর-গতিতে সেদিন ভ্যান চালিয়ে যাচ্ছিল টুইকেন হ্যাম ব্রীজের উপর দিয়ে। সহকর্মী তখন ওকে প্রশ্ন করে এখন ও কি করবে।

—আমি জানি না ভাই কি করব, ব্রেইন সখেদে বলেছে, ভাবছি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব।

ফ্রস্ট বলেছে তার চেয়ে কোম্পানীর কাছে সব কিছু বলে আত্ম-সমর্পণ করাই ঠিক হবে।

—কিন্তু তার পরিণাম জানো তো? ও ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চাই।

এরপরই গাড়ি থামিয়ে সে নিচে নেমে ফ্রস্টকে বলে, তুমি ভাই ভ্যানটা নিয়ে চলে যাও। আমি বুঝতে পারছি না কি করব। আমি হয়তো চ্যানেল পেরিয়ে স্পেনে পালিয়ে যাব।

এর অনতিকাল পরেই ব্রেইন গিয়ে উপস্থিত হয় ক্যাম্বারওয়েল-এ অপর একজন সহকর্মীর বাড়ি এবং কিছু টাকা ধার চায়। সে তাকে বলে যে তার চাকরী গেছে সে কেন্ট-এ ডার্টফোর্ড নামক শহরে যাবার রেলভাড়া চায়। এরপর থেকেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরই তিন ঘণ্টা বাদে মার্ডার ভ্যান আবিষ্কৃত হয়। এবার শুরু হয় চাঞ্চল্যকর তল্লাসী কার্য।

সে এত চতুর যে বাড়ির সঙ্গেও কোনপ্রকার সংযোগ রাখে নি। এমন কি যে মেয়েটি তার প্রেমিকা এবং যার সঙ্গে একুশে জুলাই তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গেও সে ঘুণাক্ষরে যোগাযোগ রক্ষা করে নি। খবর পেয়েছিলাম যে খুন করবার পরের রাতে সে তার ফিয়াঁসীর সঙ্গে দেখা করে কিন্তু ভুলেও এই ভয়ঙ্কর অপকর্মের কোন উল্লেখ করে নি তার কাছে। যদিও হাজার হাজার পুলিস তীক্ষ্ণ নজরে খুঁজে ফিরছিল ওকে এবং দেশের যাবতীয় সংবাদপত্রে ওর দেহের বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলে যে-কোন লোক ওকে

দেখামাত্র চিনে ফেলত—এরকম সঙ্গীন অবস্থায়ও বিস্ময়কর ভাবে সে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিল।

সাতাশ বছর বয়সের জর্জ ব্রেইন বেশ স্বাস্থ্যবান ও আমুদে ধরণের মানুষ। সে পছন্দ করতো মেয়েছেলে, গ্রে হাউণ্ড রেস, বিলিয়ার্ড এবং খুন।

এরপর এল টেলিফোনের বন্যা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে এর জন্য নতুন স্টাফ নিযুক্ত করতে হয়েছিল দিবারাত্রের জন্য।

'জর্জ ব্রেইনকে দেশের যাবতীয় স্থানে শতশত লোকেরা নাকি দেখেছে। সবই ভুয়া। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দূর দূরান্তরের পাড়া গাঁ থেকে মফঃস্বল শহর ও যাবতীয় নগরে নাকি এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শত শত সন্দেহভাজন মানুষদের ধরে এনে জেরা করেছে পুলিস। কিন্তু ব্যাপার যথাপূর্বং। ব্রেইনের কোন পাত্তা করা গেল না। এমন নিখুঁত ভাবে তল্লাসী ও অনুসন্ধান চলছিল যে কারুর পক্ষে কোনমতেই লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। শেষে এই ধারণাই সবার মনে এল যে সে আত্মহত্যা করে ধর্মাধিকরণকে ফাঁকি দিয়েছে।

ঘটনার দশদিন পরে টেমস নদীতে জাল ফেলে ফেলে হন্দ হওয়া গেল। নর্দমা, বোট হাউস হাউস বোট, বনজঙ্গল চষে ফেলা হল। কিন্তু কোন ফল দর্শালো না।

তবে সবার অলক্ষে ওর অজ্ঞাতবাসের দিন বুঝি দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। ২৫শে জুলাই বিকেলে ওকে একজন স্কুলের ছাত্র প্রথম দেখে সমুদ্র উপকূলে। ছেলেটি তার বাবা মায়ের সঙ্গে সিয়াবনেস নামে কেন্টের সমুদ্র উপকূলে গিয়েছিল ছুটি কাটাতে। ছেলেটি সমুদ্রতীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওকে দেখে। ছেলেটি বিচারের থাকতে ওকে চিনতো। ব্রেইন লুকিয়েছিল সমুদ্রতীরের একটি শিলাখণ্ডের পাশে।

ছেলেটি তার বাবাকে জানায় যাকে সারা ব্রিটেনে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে সে দেখেছে শিলাখণ্ডের ওপাশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় পুলিস এসে ক্লীফ-এর ঘাসজঙ্গলে শোওয়া অবস্থায় ব্রেইনকে

পাকড়াও করে।'

ঐ স্থানটি প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডববর্জিত কল্পনাতীত স্থান। এখানে কোন মানুষ থাকতে পারে এটা অভাব্য। ব্রেইন ভেবেছিল এখানে সে যতদিন না ধরপাকড়ের হট্টগোল থেমে যায় লুকিয়ে থাকবে। তারপর সুযোগ বুঝে জাহাজে চেপে বিদেশে পাড়ি জমাবে। দাড়ি গোঁফে মুখ ভর্তি, রোদে জলে চামড়া কালো হলেও তার চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

সিয়ারনেল পুলিস ষ্টেশনে গিয়ে আমি ওকে জানাই,—রোজ মুরিয়াল অ্যাটকিনস্‌কে হত্যার অপরাধে তোমায় গ্রেপ্তার করা হল।

তখন সে একটি বিবৃতি দেয় যেটাকে মোটামুটি স্বীকারোক্তিই ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য ওর বিরুদ্ধে যে কেস তাতে অন্য কিছু তৈরী করা গল্প বললেও সে পার পেত না। চীফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর চেরিল মেয়েটির হ্যাণ্ডব্যাগে ব্রেইনের তর্জনীর ছাপ আবিষ্কার করেছিল। এই একটি প্রমাণই তাঁকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরাবার পক্ষে যথেষ্ট।

ব্রেইন আমাকে বললে, আমি সত্যি কথাই খুলে বলব। এটাই এখন আমার পক্ষে একমাত্র করণীয় কর্তব্য।

কিছুক্ষণের জন্য সে বিহ্বল হয়েছিল। সেই প্রথম ও শেষবারের মত তাকে আমি দুঃখিত বা অনুতপ্ত হতে দেখেছি। এ ছাড়া পরবর্তীকালে সব সময়েই হাসিখুশী, নির্ভিক ও বেপরোয়া ভাব চালিয়ে গেছে এই ক্রিমিন্যাল।

—আমি মেয়েটিকে চিনি প্রায় একবছর, ব্রেইন বলে যায়, আমি সর্বসাকুল্যে বার চারেক ওকে দেখেছি কাছাকাছি। আমি ওকে রোজ বলেই জানতাম। বুধবার রাত্রে আমি ওকে রাস্তার কোণ থেকে তুলে নিই। ভ্যানে সে আমার পাশেই বসেছিল। রোজ বলেছিল, তার খুব আর্থিক টানাটানি চলছে। সে কিছু টাকা চায়।

—আমি বলি, ব্রেইন বলে যায়, আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু

আশা করো না। তাতে রোজ শাসায়, যদি আমায় কিছু না দাও তো তোমার ফার্মকে আমি জানিয়ে দেব যে তুমি ভ্যান নিয়ে নিজের ইচ্ছে মত যত্রতত্র অধিক রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াও কোম্পানীর তেল অযথা পুড়িয়ে। আমি বলি, মিছে ঝুট ঝামেলা করো না রোজ।

—সে আমার নাম যে জর্জ ব্রেইন তা জানত, কেন না সে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখেছিল। ওর কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হয়ে যায়, আমি ওকে হাত দিয়ে আঘাত করি। ও চীৎকার করে ওঠে।

এইখানে এসে ব্রেইন সেই চিরাচরিত ক্রিমিন্যালদের কৌশল অবলম্বন করে বলল, তারপর আর কিছু মনে নেই, সব বিস্মৃতির অন্তরালে ডুবে গেছে। আমি স্টারটিং হ্যাণ্ডেল দিয়ে ওকে আঘাত করি। আমি জানি আমার মধ্যমাঙ্গুলীর পেছনে আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমার যখন হুশ ফিরে এল তখন দেখি ওর দেহ ভ্যানের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। তখন আমি রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। তারপর একটা নির্জন স্থানে ওর দেহটা ফেলে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়ি চলে আসি। মা জিগ্যেস করে কোথায় ছিলাম এতক্ষণ। আমি বলি রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে জল দিয়ে গাড়ির ভেতরটা ধুয়ে ফেলি। পরে গাড়ি নিয়ে ফ্রস্টকে তুলে নিই এবং কার্যস্থলে চলে যাই। কম্বলটাকে ব্যাগে ভরে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিই।

মেয়েটার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে মাত্র চার শিলিং পাই। সেটা বের করে হ্যাণ্ডব্যাগটাকে লুকিয়ে রাখি। মুচির একটা ছুরি ছিল ভ্যানে সেটাও গ্যারেজে একটা লোহার পাতের পেছনে রেখে দিই। ছুরিটা রক্তমাখা ছিল। ফার্মের প্রায় তিরিশ পাউণ্ড আমি নিয়েছিলাম। অফিসে মেয়েদের বলি যে টাকাটা আমি বাড়িতে রেখে এসেছি। আসলে আমি সে টাকা নিয়ে ডগ রেসে যাই এবং সমস্ত হেরে আসি।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে রোজ কখনো ওকে শাসায় নি। ঘটনার দিন ব্রেইন উইমবেলডন গ্রে হাউণ্ড রেসে গিয়ে কোম্পানীর টাকা

সব হেরে যায়। আমার ধারণা যে ব্রেইন মেয়েটাকে গাড়িতে তুলে নেয় মেয়েটিকে খুন করে তার অর্থ অপহরণ করে কোম্পানীর টাকা শোধ করবার কুমতলবে। সে কালবিলম্ব না করে গাড়িতে ওঠবার পরেই রোজকে মুচির ছুরি দিয়ে মারাত্মক কয়েক ঘা-য়ে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু এতবড় ভয়ঙ্কর হত্যার পরিবর্তে ব্রেইন পায় মাত্র চার শিলিং। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে রাতে রোজের কাছে মাত্র ঐ পরিমাণ অর্থই ছিল।

অবাক কাণ্ড, ব্রেইন শুধু যে অবিচল ছিল তাই নয় সে সদা প্রফুল্ল ও সতেজ ভাব আগাগোড়া রেখে গিয়েছিল।

যখন ওকে আমি প্রথম দিন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গাড়ি করে নিয়ে যাই তখন ব্রেইন আমাকে গাড়ির জানালাগুলো বন্ধ করতে অনুরোধ করে পরিহাস তরল কণ্ঠে কলার তুলে দিয়ে বললে, আমার এই মূল্যবান গলাতে আগে থাকতেই ঠাণ্ডা লাগাতে চাই না।

জুরীরা ওকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। মাত্র ষোল মিনিটের মধ্যেই।

ব্রেইন আশ্চর্য শান্তভাবে জজের চরম দণ্ডাদেশ উচ্চারণ শুনে গেল। সে যেন ভয় পেতে রাজি নয়। জীবনের শেষ তিন সপ্তাহ সে হাসিখুশীভাবেই কাটিয়ে গেছে। শুধু যে জেলারের সঙ্গেই হাসিঠাট্টা করেছে তাই নয় কনডেমণ্ড সেল-এ, শেষ মুহূর্তে জল্লাদের সঙ্গেও রসিকতা করে গেছে।

তার ফাঁসি হল তার মায়ের জন্মদিনে। এটা অবশ্য কাকতালিয় ঘটনা।

নিয়তির পরিহাস, যাকে অহেতুক ও নৃশংভাবে মেরে সে ফাঁসিতে প্রাণ দিল সেই বিবাহিতা দুই সন্তানের জননী রোজ মারিয়েল অ্যাটকিনস্ সে সময় একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল এবং এমনিতেই তার আয়ু এক বছরের বেশি ছিল না।

নম্বর ওয়ান খুনীকে আমি ধরেছি

(প্যারিস)

ফরাসী চীফ ইন্সপেক্টর চার্লস শেনেভিয়ার বললেন ঃ

ফরাসী দেশের কুখ্যাততম খুনী ও তার দলকে পাকড়াও করতে আমার সময় লেগেছিল পাক্কা তেরটি বছর। সমস্ত পুলিসী শক্তি প্রয়োগ করে পুরো তেত্রিশ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল একদিন ফলল।

শেষের সেদিনের নাটক জমলো থ্রি-শেল নামক ক্ষুদ্রকায় একটি রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে। জনাকীর্ণ সেই দোকানে কর্নারের এক টেবিলে বসা ফ্যাকাসে মুখের এক ব্যক্তি বয়কে অর্ডার দিল, স্ট্রবেরিজ আর ক্রিম নিয়ে এস। লোকটা বাঁ হাতে নার্ভাস ভাবে গগলস্‌টাকে নাকের ওপর ঠিক করে নিচ্ছিল। কিন্তু ডান হাতটি তার বুকের মাঝখানে একটা বোতামের কাছে ধরা ছিল। হাতটি সেখান থেকে সে একেবারেই নড়াচ্ছিল না।

টেবিলে বসেই সে দেখতে পেল বাইরে একটি দামী লিমোসিন গাড়ি এসে দাঁড়ালো তা থেকে দুজন মূল্যবান পোশাক পরিহিত যুবা ও একজন রূপসী মেয়ে নেমে রেস্তোরাঁতে এসে প্রবেশ করল।

চমৎকার গাড়িটা। চামচে দিয়ে বাঁ-হাতে ক্রিমের পেয়ালা নাড়তে নাড়তে নিজমনেই লোকটা বলে ওঠে, এরা খুবই ধনী সন্দেহ নেই।

তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সদ্যআগত রূপসীর কাঁধের হীরার ব্রোচটার প্রতি যেন আটকে গেল। ডান হাতটি তার তেমনি বুকের একটি বোতামের ফাঁকে ধরা রয়েছে।

সহসা রেস্তোরাঁর পেছনে টেলিফোন বেজে উঠল। বারম্যান তা ধরে খদ্দেরদের পানে তাকিয়ে বললে, মসিঁয়ে আন্দ্রে কে আছেন, তার ফোন।

লিমোসিনে আসা দুজনের একজন উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোনের দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে গেল।

সে যখন সেই ফ্যাকাসে মুখের লোকটির পেছন দিয়ে যাচ্ছিল মুহূর্তে সে থেমে চামচে নাড়া লোকটার কাঁধ ধরে প্রবলভাবে নেড়ে দিল! বিস্মিত লোকটির হাত থেকে চামচে ও বুকের ভেতর থেকে রিভলবারটা ঝনঝনিয়ে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল।

একই সময়ে রিভলভিং দরজা ঠেলে আমি প্রবেশ করলাম সেই রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে। 'মসিঁয়ে আঁন্দ্রে' আসলে হল আমার সহকারী ডিটেকটিভ রজার বর্নিচ। সে কালক্ষয় না করে লোকটির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল চোখের পলকে। ধাক্কাধাক্কিতে চোখের চশমা পড়ে যেতে তার ক্রূর ও হিংস্র চোখ দুটি উদ্ভাসিত হল।

বন্দী আমায় চিনতে পেরেছে সঙ্গে সঙ্গে। সে হিংস্র ভাবে মুখবিকৃত করে আমায় অভ্যর্থনা করল। সে বুঝতে পেরেছে টেলিফোনের ফাঁদ আমিই পেতেছিলাম।

—তাহলে আপনিই স্বয়ং ইন্সপেক্টর শেনেভিয়ার, দাঁতে দাঁত চেপে সে উচ্চারণ করলে।

হ্যাঁ তাই এমিল বুইসন। এই বার বার তিনবারে লাকি হলাম, কি বল? আমি সহাস্যে জবাব দিলাম।

এই ১০ই জুন, ১৯৫০ তারিখটি আমার এবং ফরাসী পুলিস বিভাগের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। কেননা এই দিনটিই অবসান ঘটালো আমাদের শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন বিরক্তিকর তল্লাসীর। যাকে ধরা হল সে যুদ্ধপরবর্তীকালে ফরাসী দেশে এক নম্বর শত্রু রূপে পুলিস ফাইলে চিহ্নিত ছিল। আমার দীর্ঘ ডিটেকটিভ ও পুলিসচীফ জীবনে এতবড় পাষণ্ড ক্রিমিনাল আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

আমাদের জীবনে কোন দুরন্ত কেসে সাফল্য এলে উত্তেজনা অন্তে দেখা দেয় দৈহিক এবং মানসিক ক্লান্তি। অফিসে এসে এই খুনীর ব্যাপারে বিশালাকায় ফাইল নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম অন্যমনে।

এ এক ইতিহাস, কুকীর্তিভরা খুনীব জীবনেতিহাস। এমিলিব ভাইবোনদেব সঙ্গে শৈশবেব একটি ফটোও ছিল। সবগুলো বাচ্চাই ক্ষীণকায়, তবে হাসিখুশি, একমাত্র এমিলিব মুখেই সে বয়স থেকেই হাসিব চিহ্নমাত্র নেই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মধ্যফরাসী দেশের লিয়ঁ শহবে জন্মায় এই দাগী আসামী। বাপও তেমনি, ছেলেদের কিচেন থেকে চুবি করতে শেখাত সে! বাবোটি সন্তানকে খাওয়ানো সৎপথে সম্ভব নয়। মাত্র নয় বছব বয়সেই একটি পনেব বছবের মেয়েকে পরিচালনা কবে সে প্রথম আইন ভঙ্গ কবে, অর্থাৎ একটি হার্ডওয়াব স্টোব ভেঙে অপহরণ শুরু কবে।

এমিলিব শৈশব দাবিদ্র্যে, কষ্টে দুঃখে অতীব করুণভাবে কেটেছে। বাপ ছিল একজন রাজমজব এবং বেহদ্দ মাতাল। ফলে বারোটি সন্তানেব আধাআধি অনাহাবে অনিদ্রায় পুষ্টিব অভাবে অকালে মাবা যায়! মা দেখে শুনে পাগল হয়ে যায়।

এমিলি আঠাবো বছব বযসের মধ্যেই অন্তত দশবাব জুভিনাইল কোর্টে অভিযুক্ত হয়েছে। ওবা দুভাই ক্যাশ ডাকাতিতে পাকা হয়ে উঠেছিল।

প্রথমবাব জেল থেকে খালাস পাবার পব এমিলি চলে যায় বা পাঠানো হয় তাকে উত্তব আফ্রিকায় বিদ্রোহী নেতা আবদেল করিমেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কববাব জন্য। ফলে ঐ সময় বুঝি ক্রাইমে সে তথাকথিত গ্র্যাজুয়েট হয়ে এল। কেননা সে ফরাসী দেশে ফিরে এসে তুচ্ছ ক্যাশ ডাকাতি ছেড়ে বড় ব্যবসা ধরল। স্প্যানিশ সীমান্তে অস্ত্র-শস্ত্র থেকে ঔষধের চোবাকাববারীদের সম্রাট বনে গেল সে।

চোরাকানবারের ব্যবসায়ে নেমে বুঝি প্রথম বুঝতে শিখল এবার লেখাপড়া কিছুটা শেখা প্রয়োজন। অচিরেই পডতে শিখে সে মার্কিন প্রভৃতি দেশেব কুখ্যাত খুনী ও গুণ্ডাদেব কার্যকলাপ কণ্ঠস্থ করে ফেলল।

আফিম ও কোকেনের চোরাচালানে প্রচুর লাভ জেনে ১৯৩৪-এ

সে চীনে চলে যায়। সেখানে সে ফ্যান্টাসিও নামে একটি ডান্স-হল কিনে ফেলে সাংহাই শহরে। এ নাচের ক্লাবের ছদ্মবেশ তার চোরাচালানের পক্ষে খুবই সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু পুলিস এক সময় সব জেনে হলটি বন্ধ করে দেয় এবং যথারীতি এমিলি গা-ঢাকা দিয়ে দেশের ছেলে দেশে ফিরে আসে।

এ সময় এমিলি তার অপরাধ কর্মের সহকারী রূপে নেয় জেনী নাম্নী একটি গণিকাকে। রূপসী এই রূপোপজীবিনীকে দেখতে অনেকটা সে যুগের প্রখ্যাত অভিনেত্রী পোলা নেগ্রীর মত।

এমিলির জীবনে আরও বহু মেয়েই এসেছে। তবে সবই গণিকা শ্রেণীর। কেননা তার ক্রিমিনাল জীবনে ওরাই ছিল সর্বাধিক সুবিধাজনক।

১৯৩৭-এ এমিলির কেস আমার উপর দুঃস্বপ্নের মত এসে বর্তায়। পাঁচজন সাঙ্গাৎ সহ সে তখন ট্রয়িস শহরের এক ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৬ কোটি ফ্র্যাঙ্ক নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সুচারুরূপে পূর্ব-পরিকল্পিত এটি একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি। এমিলি বুইশন উক্ত শহর থেকে প্যারিস পালিয়ে যাবার জন্য প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করে একটি দুরূহ বনময় রাস্তায় পূর্বাহ্নেই গাড়ি নিয়ে ৬।৭ বার রিহার্সেল দিয়ে নিয়েছিল। দূরত্ব প্রায় ১১০ মাইল।

যদি পালাবার অসুবিধে হয় তাহলে যাতে উক্ত শহরেই কিছুকাল গা-ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয় তার জন্য একটি ভূষিমালের গুদোমঘর এমিলি আগেই ভাড়া করে রেখেছিল। নিখুঁত পরিকল্পনায় ডাকাতি করে তারা হাওয়া হয়ে যায়।

ধরন দেখে আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম যে এটা বুইসন-এরই কীর্তি। কিন্তু আমার হাতে সঠিক কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল না। ইতিপূর্বে প্রমাণাভাবে সে বারো-তেরোটি কেস থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। এবার আমি সে সুযোগ ওকে দেব না স্থির করেই কাজে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

সৌভাগ্যদেবী এবার কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হলেন। ওরই জনৈকা রক্ষিতার এক রেস্তোরাঁর পেছনের ঘরে ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় আমি পাকড়াও করলাম। জেগে উঠে আমাকে চিনতে পেরে হাই তুলে সে বলে উঠল, মাই ডিয়ার ইন্সপেক্টর শেনেভিয়ের, আমার নিখুঁত অ্যালিবাই রয়েছে। শুনে রাখুন, ট্রয়িস-এর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না মসিঁয়ে।

পরে আমি যখন বুইসনের শোবার ঘর ত্যাগে উদ্যত তখন ঘরের দরজার কাছে একটি ছাতা দেখতে পেলাম। এবারও ভাগ্যদেবী সহায় হলেন, আমি ছাতার ভেতর থেকে প্রচুর ১০০০ ফ্র্যাঙ্ক নোট আবিষ্কার করলাম। এবার বুইসনের চোখও বোধ করি ছানাবড়ার আকৃতি ধারণ করল। প্রতিটি নোটের নম্বর উক্ত ব্যাঙ্কের ডাকাতি হওয়া নোটের সঙ্গে মিলে গেল। এই ভাবেই আমি সর্বপ্রথম বারের মত মসিঁয়ে বুইসনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে সমর্থ হলাম।

কিন্তু হায়,ধন্য শম্বুকগতিসম্পন্ন ফরাসী বিচার বিভাগ। দু বছরেও কোন সুরাহা হল না। রায় বের হবার আগেই জার্মানরা এসে ফরাসী দেশ দখল করে নিল ১৯৪০-এ। সেই সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা ও প্যানিকের মুখে বুইসন জেল থেকে পালিয়ে যায়।

এক বছর বাদে বিনা কারণে একজন ক্যাশিয়ারকে খুন করে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে। সঙ্গে ছিল কুখ্যাত ডাকাত আবেল ডানোজ, যাকে আমি পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়ে গিলোটিনে মুণ্ডচ্ছেদ করিয়ে ছিলাম।

বুইসন অপূর্ব তৎপরতায় আমার জাল ছিঁড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

তার পরবর্তী গ্রেপ্তার বড় অদ্ভুতভাবে হয়। তখনও যুদ্ধ চলছে। বুইসন ট্রেনে করে মার্সেলিস থেকে প্যারিস যাচ্ছিল। কণ্ডাক্টরের নির্দেশ অনুসারে টিকিট দেখাবার জন্য এমিলি তার স্যুটকেস খোলে বাঙ্কের উপর। পোশাক ঘেঁটে টিকিট বের করবার মুখে সেখান থেকে কতগুলো কার্টিজ বেরিয়ে বাইরে পড়ে যায় এবং পড়বি তো

পড় নিচে শোওয়া এক জার্মান অফিসারের ঘুমন্ত মুখে। তড়াক করে সে উঠে পড়ে এবং বুলেটগুলো দেখে বুইসনকে পাকড়াও করে। বুইসন তখন মেটাভিয়ার ছদ্মনামে ভ্রমণ করছিল। অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরার অপরাধে জার্মানরা ওকে জেলে পাঠায়।

আমি যখন শুনলাম ও জেলে গেছে তখন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম ট্রয়িস ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারে ওকে যেন আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস আমি আর ওর মামলায় উপস্থিত থাকতে পারলাম না। আমি তখন পুলিশ-চীফ। জার্মানরা আমাকে বিশ্বাস করত না। আমি গেস্টাপোকে ঘৃণা করতাম এবং ওদের সাহায্য করতে সরাসরি অস্বীকার করার দরুণ ওরা আমাকে ক্রীতদাসরূপে নাৎসী জার্মানীতে পাঠিয়ে দেয়। যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি সেখানে আমাকে থাকতে হয়।

আমি দেশে ফিরে আসবার ক'দিন বাদেই বুইসনের কেস নাটকীয় ভাবে ফের শুরু হয়ে যায়।

ট্রয়িস ব্যাঙ্ক ডাকাতির মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের তখন মাত্র তিন বছর কেটেছে, এমন সময় জেলের গার্ডকে বোতলের আঘাতে জখম করে সে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সতর্ক প্রহরীদের চেষ্টায় জেলের ধোপাখানার মধ্যেই ধৃত হয়। এরপর শুরু হয় ওর উল্টোপাল্টা কাণ্ডকারখানা ও চেচামেচি। ডাক্তারী পরীক্ষায় সন্দেহ হয় ওর সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে, ওকে ভোলজুইফ উন্মাদাগারে পাঠানো হয়।

বুইসনের এ-সবই চালাকী। পাগলের ভান করেছিল মাত্র। কয়েক মাস বাদে অপর দুজন প্রাক্তন কয়েদী রজার ডেকার ও হেনরী রুসাক-এর সাহায্যে পাগলাগারদের পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায়।

পুনরায় আমাদের তল্লাসী শুরু হয়ে গেল ফেরারী আসামীর সন্ধানে। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও ওর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। কে জানে এরপর কোথায় ও আঘাত হানে।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। বুইসনের অর্থের প্রয়োজন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সে ফরাসী ইতিহাসে নিদারুণ চাঞ্চল্যকর এক ডাকাতি করে বসল।

অবসর নেওয়া সুজানি ফারো নাম্নী এক গণিকার ফ্ল্যাটে লুক্কায়িত অবস্থায় বুইসন এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনার যাবতীয় ব্লু-প্রিন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করে নিয়েছিল।

আর্ক দ্য ট্রাম্প-এর নিকটে প্রখ্যাত ও অভিজাত রেস্তোরাঁ অবার্জ দ্য আরবয়েজ-কেই বেছে নিয়েছিল ডাকাতির উদ্দেশ্যে। ঘটনার রাত্রে সে ও রুসাক দুটি রিভলবার আর ডেকার একটি সাব-মেশিনগান নিয়ে অকস্মাৎ সেখানে ঢুকে পড়ে অভিজাত ধনী জনা কুড়ি নরনারী খদ্দেরকে দেয়ালের দিকে মুখ করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়াতে অর্ডার করে। বুইসন সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওয়ালেট, মানিব্যাগ, জুয়েলারী কেড়ে নেয় আর নেয় রেস্টুরেন্টের ক্যাশ থেকে এক লক্ষ ফ্রাঙ্কের মত অর্থ। কাজ প্রায় শেষ এমন সময় দরজার কাছে প্রহরায় থাকা ডেকার চেঁচিয়ে ওঠে—'পুলিস!' বলে।

ডাকাতদল এক লাফে অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে উল্কাবেগে গাড়ি চালিয়ে দেয় আর পেছন পেছন প্রাণপণে অনুসরণ করে দুজন মোটর-সাইকেলারোহী পুলিস কর্ণবিদারী সাইরেন বাজাতে বাজাতে।

মরিয়া হয়ে ডাকাতেরা বড়রাস্তা ছেড়ে এগলি-ওগলিতে কখনো কখনো ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে পালাতে থাকে এবং পেছন দিকে সাব-মেশিনগান দিয়ে গুলিবৃষ্টি করে যায়।

পুলিসদ্বয় ব্যর্থ হয়। ডাকাতেরা বেপাত্তা হয়ে যায়।

ক'দিন বাদে প্যারিসের উপকণ্ঠে রুসাক-এর বুলেটে ঝাঁঝরা মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। পরের দিন ডেকারকে আমার লোকেরা একটা বার-এ গ্রেপ্তার করে।

বাক্কে. সে থানায় স্বীকারোক্তি করে কিভাবে এবং কি জন্যে রুসাককে গেকে ক করে দেয় বুইসন। তার অপরাধ ডাকাতির সময় রেস্তোরাঁর

মধ্যে ভুলে সে বুইসনের নাম ধরে ডেকে ফেলে। অমার্জনীয় অপরাধ। দ্বিতীয়ত, নেতার কাছে লুটের মাল জমা না দিয়ে একটা হীরের ব্রোচ সে তার এক মেয়ে-বন্ধুকে দিয়েছিল। তৃতীয়ত, রুসাক নাকি ওর রক্ষিতা সেই সুজানি ফারোর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ের চেষ্টা করেছিল। এর যে কোন একটা অপরাধই ওর জান যাবার পক্ষে যথেষ্ট।

এরপর একদা বুইসন ওদের দুজনকে নিয়ে গাড়ি করে পিকনিক করতে যায়। গাড়ির মধ্যেই ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে প্রায় হাসতে হাসতে এমিলি আসামী রুসাকের মাথার খুলি চূর্ণ করে দেয় পর পর কয়েকটি গুলি করে। তারপর মৃতদেহটাকে লাথি মেরে গাড়ি থেকে ফেলে দেবার মুখে বলে ওঠে, এর দ্বারা তোমরাও শিক্ষা গ্রহণ করবে আশা করি।

আরেকটি সাঙাতেরও একই পরিণাম হয়েছিল বুইসনের হাতে। তার নাম ডিসায়ার পোলেড্রি। ১৯৪৯-এর মে মাসে একটা বিরাট ছাপাখানা লুট করে এগার কোটি ফ্র্যাঙ্ক লুটের মুখে পোলেড্রি ছিল ওর সহচর।

তার অপরাধ রিভলবার পরিষ্কার করবার মুখে অসতর্কতায় বুইসনের প্রধান সহকারী মরিস দ্য ফিশমংগারকে গুলির আঘাতে মেরে ফেলেছিল।

—ঠিক আছে, ভয়ের কিছু নেই পোলেড্রি। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তুই তো আর ইচ্ছে করে মারিস নি। ঘাবড়াস না। চল একটু গলা ভিজিয়ে আসি কোন একটা বার থেকে।

তাকেও গাড়ির মধ্যে হাসিমুখেই বুইসন সেদিন গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলল। তার দেহটাকেও লাথি মেরে বাইরে ফেলবার মুখে বলে উঠল, যা বেটা নরকে। রিভলবার নাড়াচাড়ায় এবার থেকে সেখানে হয়তো সাবধান হতে শিখবি।

বুইসনের সহকারীরা কেউই বেশিদিন বাঁচে নি। প্রত্যেকেরই কোন না কোন সময়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে।

এবারে ফ্রান্সের যাবতীয় পুলিস-বিভাগকেই ওর বিষয়ে সতর্ক

করে দেওয়া হল। আমার সমস্ত স্টাফকে নিয়োজিত করলাম যে কোন ভাবেই হোক এই দুর্দমনীয় গুণ্ডাকে পাকড়াও করার জন্য। দেশের প্রতিটি এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন, বন্দর ও সমস্ত হাইওয়েতে পেট্রোল বাড়িয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু সুচতুর বুইসন বুঝি জনারণ্য প্যারিসকেই তার গা-ঢাকা দেবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান রূপে নির্বাচিত করেছিল।

আমরা বুইসনের পরবর্তী আঘাত বা কুকর্মের দিনটির জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। কোথাও না কোথাও এবার সে ভুল করবেই। কিংবা কোন না কোন সহচর বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের খবর দেবে, এ আশায় দিন গুনতে লাগলাম।

এরপর বুইসন আরেকটি বড় ক্রাইমে হাত দিল···এবং একটি নরহত্যাও সংঘটিত হল। ১৯৫০-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী এটি ভার্সাইতে সংঘটিত হল। 'থ্রি শেল' নামক রেস্তোরাঁয় ওকে গ্রেপ্তার করবার কয়েক মাস আগের ঘটনা।

একটি বাস ড্রাইভার চামড়ার ব্যাগে কয়েক সহস্র অর্থ অফিসে জমা দিতে যাচ্ছিল। ওরা তক্কে তক্কে থেকে সেই ড্রাইভারকে গুলি করে টাকা নিয়ে গাড়ি সহ উধাও হয়ে যায়। ড্রাইভারটি মারা যায়। মারা যাবার পূর্বে তার ওপর আক্রমণকারীদের চেহারার হুবহু বর্ণনা দিয়ে যায়। যার ফলে আমরা ওদের প্রত্যেককে সনাক্ত করতে পারি। কিন্তু একই মুশকিল, আসামী কে বুঝলাম, অথচ হাতে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

তবে এবার আমি স্থিরনিশ্চিত, যে আমার হাত থেকে এরপর আর বুইসনের নিস্তার নেই। কঠিন শপথ আমার।

১৯৪৮-এর মে মাসে শুনলাম প্যারিসের উপকণ্ঠ ভিগনেক্স নামক স্থানে এমিলি তার দলবল সহ এক ভিলায় গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

আমার লোকেরা সে ভিলার দেয়াল টপকে জানালা দিয়ে দেখে গুইলো নামক এক সহচর ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে। ডিটেকটিভ তাকে

বাইরে আসতে নির্দেশ দেয়, সে অস্বীকার করে। তখন চলে উভয় পক্ষের গুলি-বিনিময়। সেই গণ্ডগোলের সুযোগে পেছন দিয়ে বাগানপথে বুইসন রাস্তায় নেমে হাওয়া হয়ে যায়।

আরেকবারও সুযোগ নষ্ট হয়। খবর এল এমিলি তার এক ভাইয়ের সঙ্গে প্যারিস বোটানিক্যাল গ্রাউণ্ডে ঘোরাঘুরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই পুলিস কর্ডনের বন্ধনকে ফাঁকি দিয়ে এবারও সে পালিয়ে যেতে সমর্থ হল।

অবশেষে মোক্ষম গোপন সংবাদ পেলাম এমিলির দ্বারা বঞ্চিতা এক গণিকার মাধ্যমে। সে জানাল, বুইসন বয় দ্য বলন-এর কাছে একটি বাড়িতে বসবাস করছে।

আমার উপরওয়ালারা প্রস্তাব করলেন বাড়িটি ঘেরাও করে টিয়ারগ্যাস ছেড়ে ওকে গ্রেপ্তার করতে। আমি রাজী হলাম না। কেননা দুর্ধর্ষ এমিলির কাছে সর্বদাই রিভলবার ও সাব-মেশিনগান থাকে। সুতরাং সে আমাদের পক্ষে বহু হতাহত করে ফেলতে পারে। তাছাড়া আমি ওকে জ্যান্ত অবস্থায়ই গ্রেপ্তারের অভিলাষী।

অতএব নির্দিষ্ট বাড়িটির উপর আমরা গোপন নজর রেখে চললাম বহুদিন।

১৯৫০-এর ১০ই জুন-এর এক সুন্দর সকালে দেখা গেল এমিলি বেরিয়ে এল বাড়িটা থেকে। এবং ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে। আধঘণ্টার মত সে প্যাথে-কোডাক ফটোপ্ল্যান্টের সামনে দাঁড়িয়ে কি সব যেন নিরীক্ষণ করল। হয়তো ভবিষ্যৎ ডাকাতি বা রাহাজানির বিষয়ে কোন পরিকল্পনা ভাঁজছিল অকুস্থল পরিদর্শন করে।

অতঃপর সে কলারটা উঁচু করে এগিয়ে গিয়ে এক সময় সেই ক্ষুদ্রকায় রেস্টুরেন্ট 'থ্রি শেল'-এ প্রবেশ করল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী একটি কাফে থেকে সহকারীদ্বয় গিলার্ড ও বরিসকে ফোন করে দিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা 'মোটর শো' থেকে ধার করা একটি

মূল্যবান গাড়ি করে রেস্তোরাঁয় এসে পৌঁছল। সঙ্গে করে এনেছে বরিস-এর রূপবতী স্ত্রীকে। একটু বাদে আমিই সেই কাফে থেকে 'মসিয়েঁ আন্দ্রে'কে ফোন করি। তারপরের ঘটনা গোড়াতেই বিবৃত হয়েছে।

এবারে স্বস্তি সহকারে এই ফরাসী জনসাধারণের এক নম্বর শত্রুর ফাইলে লিখে দিলাম 'কেস ক্লোজড'।

পুরো চার বছর লাগল রায় বের হতে। ফরাসী আইনে কেবলমাত্র সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধেই প্রাণদণ্ডের বিধান রয়েছে। আর এমিলির জীবনভরের কীর্তিকলাপ তো অজস্র।

প্রাণদণ্ড হল। তদোপরি অপরাপর অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চারটি অভিযোগে, একটিতে বিশ বছর জেল।

যদিও ওর প্রাণদণ্ড রিপাবলিক প্রেসিডেন্টের দয়ায় মকুবও হত, তাহলেও ওকে এ জন্মে আর জেলের বাইরে আসতে হত না।

সে কথা এখানে অবান্তর, কেননা চরম দণ্ড নিয়েই এই অসাধারণ ক্রিমিনাল এ-ধরাধাম থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিল।

পুলিস বিভাগের সঙ্গে সারাদেশও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

লেডি এলেন খণ্ডিত দেহে
(রোম)

কমেন্দেতোর জিওসেপ্পি দোসি বললেন ঃ

আমার ডিপার্টমেণ্টে যখনই কোনো মার্ডার কেসের তদন্ত আসে তখনই আমার মনে পড়ে যায় বর্তমান শতাব্দীর অতি কুখ্যাত খুনী, কাউণ্ট সিজারো সারভিয়েত্তির কথা।

এর কেসেও যথারীতি প্রথমটা যথেষ্টই বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের। পরে অবশ্য যা হয়ে থাকে, সূত্র-প্রাপ্তির পর তা জলবৎতরলম হয়ে গিয়েছিল।

সারভিয়েত্তি নারী শিকার করে পরে অর্থের লোভে তাদের হত্যা করে ফেলত। অতঃপর সেই নারীদেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলত কশাইদের মত। সারভিয়েত্তিকেও একবাক্যে একটি নৃশংস কশাই-রূপেই অভিহিত করা যায়।

লোকটার দুর্ভাগ্য শুরু হয় তার বাল্যবয়স থেকেই। কেননা ওর বাবা, ইটালিয়ান আর্মির একজন ক্যাপ্টেন, ভ্রষ্ট চরিত্রের বুদ্ধিহীন ইতর এক ব্যক্তি।

তার মৃত্যুকালে এই সিজারোর বয়েস ছিল চৌদ্দ বছর। ছেলেকে সে দিয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু সম্পত্তি, শিল্পকলার প্রতি অনুরক্তি এবং শয়তান এক ভাবধারা।

তেরো বছর বয়সের পুত্রকে সে এক গণিকালয়ে নিয়ে গিয়ে নম্নোক্ত মহৎ উপদেশ দান করে :

—বুঝলে বৎস, নারীজাতির জন্ম আমাদের আনন্দ-বিধানের জন্য, ওদের নিয়ে ফুর্তি করবার জন্য। তোমাকে সে কতটুকু খুশী করতে পারল তার দ্বারাই ওদের মূল্য নিরূপিত হবে, এ ছাড়া মেয়ের জাত নির্বোধ শুয়ারের সামিল।

ওর মা ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে একটি উদ্ভট জীব বিশেষ। এই ধরনের বহুপদেশ থেকে ছেলের মন মুক্ত করা কিংবা ছেলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা পাওয়ার শক্তি বা কৌশল তার আদৌ ছিল না। সে শুধু নানা ধরনের মদকেই প্রাণাধিক ভালবাসত। বাতে আধা-পঙ্গু এই মহিলার মেজাজ ছিল অতি তিরিক্ষি। নিজের মদের গ্রাস সদাসর্বদা পূর্ণ করার জন্য, স্বামীর বহু কষ্টে সংগৃহীত যাবতীয় মূল্যবান বস্তু একটি একটি করে সে বিক্রী করে দিয়েছে। যখন তার মৃত্যু হল সিজারোর বয়েস তখন আঠারো। সে যেন মুক্তি পেল, স্বস্তি পেল মায়ের মৃত্যুতে।

কয়েক বছরের মধ্যেই পিতৃ বিষয়-আশয় ফুঁকে দিল সে। আর যেহেতু কোনো কাজেই ট্রেনিং ছিল না, কোনো পেশা তো দূরস্থান সেহেতু সে অদ্ভুত পথই বেছে নিল। পুরুষ রাখে রক্ষিতা, কিন্তু সিজারো নিজে হয়ে গেল লা স্পেজিয়া শহরের মেয়েদের টুপির দোকানের মালিক একজন মহিলার দ্বারা রক্ষিত।

নাম তার রোজ, ওর চেয়ে বয়সে অন্তত দশ বছরের বড়। প্রথম কিছুদিন এই অবৈধ প্রণয়ী-যুগল বেশ ভালভাবেই আমোদ-আহ্লাদে কাটালো। তারপর দুজনের মধ্যে কলহ উপস্থিত হল। সম্ভবত কারণটা হল সারভিয়েত্তি হাতখরচের বাবদ যে পরিমাণ অর্থ চায় মহিলাটি তা দিতে নারাজ। এ ছাড়া মহিলাটির বয়স বেড়ে যাওয়ায় রূপ-যৌবনের জৌলুসে স্বাভাবিকভাবেই ভাটা পড়ে গিয়েছিল, কলহের সেটাও বোধকরি অন্যতম কারণ।

বোঝার ওপর শাকের আঁটি না বলে বিস্ফোরক অগ্নিশলাকা বলাই সমীচীন, কেননা যেদিন মহিলাটি তার কলহপ্রিয় প্রণয়ীকে জানাল সে মা হতে চলেছে, অমনি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। তেলে-বেগুনে-জ্বলা সারভিয়েত্তি ফায়ার প্লেস থেকে লোহার ডাণ্ডা পোকারটা হাতে নিয়ে কয়েক ঘা হাঁকড়ে অচিরে হত্যা করে ফেলল মহিলাটিকে।

বাড়ির বাগানে তাকে কবর দিয়ে তার ওপর দিয়ে সন্তর্পণে

পাথরের একটা রাস্তা বানিয়ে দিল।

সারভিয়েত্তির মনে আদৌ কোনো দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত হয় নি। সে তার পড়শীদের ও খদ্দেরদের বললে যে, সিনোরা রোমে এক ফ্যাশনেবল অঞ্চলে নতুন বিজনেস শুরু করে সেখানে চলে গেছে। সে লা স্পেজিয়াতে রয়ে গেছে এ দোকানটা বিক্রী করবার ব্যাপারে। তারপর সে-ও রোমে চলে যাবে। অতি সস্তায় সে যাবতীয় সরঞ্জামসহ দোকানটাকে বিক্রয় করে দিল, কেউ ওকে ওর বিক্রী করবার অধিকার আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই করল না।

যেভাবে অতি সহজে লোকেদের বোকা বানিয়ে নিজেকে সন্দেহ-মুক্ত রাখল, তাতে করে ও খুনের পর খুন করতে কালক্রমে অতি অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

শেষকালে যখন একদিন তার মুখোশ উন্মোচিত হল তখন একটি সংবাদপত্র ওর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল এই বলে যে, 'মার্ডার অন এ ক্যাশ অ্যাণ্ড ক্যারি বেসিস'। মহিলারা ক্যাশ দিত আর কাউন্ট ক্যারি (বহন) করত তাদের শব।

কতগুলি নারী-হত্যা সে করেছিল তার সঠিক সংখ্যা আজও নিরূপিত হয়নি। তবে এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে বহু নারীকে ওর সংস্পর্শে আসার পর আর এ দুনিয়ায় দেখা যায় নি। প্রতিবারই সারভিয়েত্তি অবিবাহিত কুমার হিসেবে মেয়েদের কাছে টোপ ফেলেছে।

যেদিন বিপরীতগামী দুটি ট্রেনে সুটকেস-অভ্যন্তরে খণ্ডিত-নারীদেহ পাওয়া গেল, তখনই পুলিস সর্বপ্রথম বুঝতে পারল মারাত্মক এক দানব এ দেশে বিচরণ করে ফিরছে।

১৬ই নভেম্বর টুরিন থেকে সকালের এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসে দাঁড়াল নেপল্‌স্‌ শহরে স্টেশনে। দুজন রেলওয়ে পুলিসম্যান (মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট শাসনকালে এদের প্রবর্তন করেন) করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে দুটি বিশালকায়

ফাইবারের স্যুটকেস পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে দেখল। স্যুটকেস দুটি নতুন এবং বেশ ভারী। পুলিস অফিসাররা সে দুটিকে নিয়ে লস্ট্ প্রপার্টি অফিসে জমা দিতে যায়।

একটা স্যুটকেস শেলফে তোলার মুখে তালা খুলে যায় এবং একজন নারীর কর্তিত মুণ্ডু মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। স্যুটকেসের ভেতরে মোটা করে ব্রাউন পেপার ও কাঠের চোকলা বিছানো ছিল।

মুণ্ডুটাকে একজন তুলতে তার সঙ্গী অপর জন দ্বিতীয় স্যুটকেসটি খুলে ফেলে, তাতে দেখা যায় রয়েছে দুটি পা এবং দুটি হাত।

দেহকাণ্ডটি পাওয়া গেল পরদিন লা স্পেজিয়া থেকে রোমে-আসা একটি ট্রেনে। একই রকম বড় স্যুটকেস, একই রকম কাগজ ও কাঠের চোকলার প্যাকিং। এক্ষেত্রেও রেলওয়ে পুলিস সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে স্যুটকেসটি পায় যার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় উলঙ্গ দেহকাণ্ডটি হাত পা ও মুণ্ডবিহীন অবস্থায়। ডাক্তাররা উভয় ট্রেনে পাওয়া দেহাংশগুলি একই রমণীর বলে অভিমত প্রকাশ করে। পরীক্ষা করে তারা জানায়, তরুণীর বয়েস তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, মাঝারী উচ্চতাসম্পন্ন, বাদামী চুল ও চোখ। বাঁ পা-টা সামান্য খোঁড়া, সারা দেহে বহু পুরনো ক্ষতচিহ্ন বর্তমান।

তরুণীকে পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয় নি। এই বীভৎস ঘটনা শুনলে শিহরিত হতে হয়। ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করে যে, বেচারা মেয়েটাকে তার অর্ধচেতন অবস্থায়ই কেটে টুকরো টুকরো করা হয়।

পুলিস তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল। তবে এ ধরনের নরহত্যা-ঘটিত তদন্তকার্যে বিশ্বের যাবতীয় পুলিস-বিভাগের যে অভিজ্ঞতা তা থেকে বলা যায়, অপরাধী গ্রেপ্তারে প্রয়োজন হয় : সাত দশাংশ ধৈর্য ও উৎসাহ, সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি দুই দশাংশ, আর এক দশাংশ ভাগ্য।

স্কোয়াড্রা মোবাইল (হোমিসাইড ব্যুরো) কাজ শুরু করল খণ্ডিত-দ্বিখণ্ডিত নিহত রমণীর সঠিক পরিচয় নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে। দেশের

যাবতীয় নিরুদিষ্ট নারীদের একটি তালিকা প্রণয়নে তারা ব্রতী হল।

কোন প্রকার সূত্র সামনে নেই। টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিণ্টার মেসেজ, সার্কুলার, নোটিস ইত্যাদি চালাচালি করে ছেয়ে ফেলা হল দেশের যাবতীয় পুলিস স্টেশন, কিন্তু সবই বিফল হল।

এই ধরনের তল্লাসীকার্যের ফলে সাধারণত জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু এবার তা পাওয়া গেল না মুসোলিনীর ডেস্ক থেকে আসা একটি কঠোর নির্দেশে। সে নির্দেশে ছিল কোনো গুরুতর অপরাধের বিশদ বিবরণ কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে পারবে না। পুলিস তাদের ক্রমাগ্রসর তদন্তের বিষয়ে ৩০ লাইনের বেশী সংবাদ প্রেসে দিতে পারবে না। মুসোলিনীর মতে ফ্যাসিস্ট ইটালীতে জঘন্য ধরনের কোনো অপরাধ অনুষ্ঠান সংঘটন আদৌ সম্ভব নয়। যদি কোনোক্রমে তা ঘটেও যায়, সেটা যত কম প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

সে যাই হোক, তদন্তকার্য যখন প্রায় দাঁড়িয়ে পড়বার উপক্রম হল তখন সংবাদপত্রেরা স্থির করল্ দুনম্বর ডিউসের (মুসোলিনীর) নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা না করবার। ফলে প্রথম পৃষ্ঠায় খণ্ডিত রমণীর যাবতীয় কাহিনী বড় হেড লাইনে বেরিয়ে গেল।

এবারও দেখা গেল্ রহস্যের পর্দা উঠতে শুরু করেছে। পুলিস প্রথম ট্রেনের দুজন প্যাসেঞ্জারের কাছে জানতে পারে যে, মাঝ বয়সী শক্ত-সমর্থ পাকানো গোঁফের একজন লোক তাদের কামরায় ওঠে। হাতের দুটি সুটকেস লাগেজ র‍্যাক্-এ স্থাপন করে কোণের একটি সিটে বসে পড়ে। এই দুজন যাত্রী এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। যখন গাড়ি নেপল্‌সের পথে রোমে এসে থামে, তারা জেগে উঠে দেখে সেই লোকটা নেই, কিন্তু সুটকেস দুটি পড়ে আছে পূর্ববৎ।

লোকটার এই বর্ণনা পেয়ে পুলিশ খুঁজে বের করে যে লা স্পেজিয়াতে এই লোকটি উক্ত ট্রেনে আরোহণ করে। লোকটা পরের স্টপ পিসা পর্যন্ত গিয়ে নেমে পড়ে এবং লা স্পেজিয়াগামী ফিরতি

ট্রেনে উঠে ফিরে যায়।

এর ফলে এই কেস আমার হাতে এসে যায়। কেননা তখন আমি লা স্পেজিয়ার হোমিসাইড স্কোয়াডের চীফ ছিলাম। এর আগে পর্যন্ত এটা একটা রোম নগরীর কেস বলেই পরিগণিত ছিল। কিন্তু ঘটনার অগ্রগতিতে এখন মনে হল খুনীটি আমাদের শহর লা স্পেজিয়াতেই বিরাজ করছে এবং তাকে পাকড়াও করা আমাদেরই কর্তৃত্বাধীন।

আমার ডিপার্টমেন্টের যাবতীয় অফিসার এই দানবকে পাকড়াও করবার জন্যে একপায়ে দণ্ডায়মান হয়ে গেল।

প্রথমেই আমরা যদি কোনোপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা সূত্র পাই খুনীর বিষয়ে সেজন্য শহরের শত শত হোটেল-বোর্ডিং-হাউসের মালিকদের একে একে জেরা শুরু করলাম। পরে ধরলাম অজস্র বস্তী এলাকা এবং গণিকাপল্লীগুলি, কিন্তু আশাব্যঞ্জক কিছুই পেলাম না।

প্রায় হতাশ অবস্থা। এমন সময় এ-ব্যাপারে পরম সৌভাগ্যের এক খণ্ড বস্তু যেন আমাদের হাতে এসে গেল। সেটা এল এইভাবে। নিরলস পরিশ্রমের পর আমরা ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্থ। দিন দুই বাদে স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে দেখলাম একটি বালক একগাদা রাবিশস্তূপের তলায় একটা কিচেন নাইফ (ছুরি) কুড়িয়ে পেয়েছে এবং সং নাগরিকের মত সেটা থানায় জমা দিয়েছে। লস্ট্ প্রপার্টি অফিসে সেটি পড়ে আছে প্রকৃত মালিকের নিয়ে যাবার প্রতীক্ষায়।

চট করে আমার মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেল। ভাবতে বসলাম উক্ত রান্নাঘরের ছুরিটি কি কি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এক সময় আমি লাফিয়ে উঠে একজন সহকারীকে নিয়ে হারানো বস্তুর অফিসে গেলাম। ছুরিটি চেয়ে এনে পুলিশ ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করাতে তার ফলায় মানুষের রক্তের চিহ্ন আবিষ্কৃত হল।

কালবিলম্ব না করে কাজ শুরু করে দিলাম। শহরের যাবতীয় এই ধরনের ছুরি বিক্রী করে এমন দোকানে দোকানে ক্লান্তিকর

তদন্তকার্য শুরু হল। অবশেষে জনৈক সেলসম্যান বললে, তার স্মরণ আছে একজন শক্ত-সমর্থ পাকানো গোঁফের মাঝবয়সী মানুষ এটি কিনে নিয়ে যায়। ঠিক হ্যায়। এ তো রোম এক্সপ্রেসের সেই যাত্রীদ্বয়ের বর্ণনার সঙ্গে এ লোকটার বর্ণনা হুবহু মিলে গেল। শুধু এই নয়, কয়েকটি দোকান পরে আমাদের সেই একই আকৃতির অজ্ঞাত ব্যক্তি তিনটি ফাইবার স্যুটকেস কিনেছে সে খবরও পাওয়া গেল।

আমরা স্থিরনিশ্চিত হয়ে গেলাম যে খুনী দানবকে অবশ্যই লা স্পেজিয়াতেই পাওয়া যাবে। আমাদের প্রতিটি ডিটেকটিভ বাড়ির পর বাড়ি অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যেতে আরম্ভ করে দিল। কোনো বাড়িকে রেহাই না দিয়ে আমাদের তল্লাসীর পরিধিকে ক্রমশ কমিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল একটি স্ট্রীটে।

১৫ই ডিসেম্বর, খণ্ডিত মৃতদেহ প্রাপ্তির প্রায় একমাস বাদে আমরা নিশ্চিত হলাম একটা বিশেষ পুরনো বাড়ির পাঁচতলার ঘরই আমাদের প্রার্থীত আসামীর আবাসস্থল। অঞ্চলটি দরিদ্র মানুষপ্রধান এলাকা।

একদিন ডিটেকটিভ ক'জনকে রাখলাম বাড়িটির প্রতি নজর রাখতে।

তারা সংবাদ দিল ও বাড়ি থেকে সেদিন কেউ বাইরে বের হয় নি. আমরা ঠিক করলাম এই হল উক্ত গৃহে প্রবেশের সময়।

হাতে রিভলবার নিয়ে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম পাঁচতলায়, উত্তেজিত দেহ-মন সহকারে। প্রচুর পরিশ্রম গেছে আমাদের, এবার সফলতার দ্বারে এসে পৌঁছেছি প্রায়। পেছনে আমার একজন সহকারী ডিটেকটিভ। পাঁচতলার দুটি দরজার একটি দেখলাম সামান্য খোলা অবস্থায় রয়েছে। পা টিপে টিপে সামনে গিয়ে দেখলাম ওটা একটা রান্নাঘর। একটা জিনিষ দেখে খুবই আশ্বস্ত হলাম। ঘরের একপাশে একটা বালতি-ভর্তি কাঠের চোকলা। ঠিক মৃতদেহাংশ ভর্তি স্যুটকেসের মধ্যে যে রকম পাওয়া গিয়েছিল, হুবহু

লালাভ কাঠের চোকলা।

রান্নাঘরের থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম সেখানে। ঘরটি প্রাচীন ও অভিজাত আসবাবপত্রে ভর্তি। সে ঘরে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দুজন লোক দাঁড়িয়ে। শব্দ পেয়ে তড়িৎগতিতে তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার হাতে উদ্যত রিভলবার দেখে ত্রস্তে পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করল।

তারা উভয়ে হাত তুলে ধরল মাথার উপর। একজন সহসা বলে ওঠে, বোধ করি আমাদেব পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আমি রোমের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের কমিশনার এররিকো আর এ আমাব সহকারী সিনর মুসকো।

একথা শুনে আমি একেবারে বোবা হয়ে গেলাম। ক্রোধ, হতাশা, ক্ষোভ, অপ্রস্তুতঅবস্থা, অভিমান সব রকম অভিব্যক্তি মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন তুলল। বুঝুন অবস্থা, আমি কিনা আমার শহরেই প্রবঞ্চিত হলাম, পরাজিত হলাম, সেই সব লোকেদের দ্বারা যাদের কর্মক্ষেত্র ২৫০ মাইল দূরবর্তী বাজধানী নগরীতে। আর তারা কিনা তাদের পরিকল্পনার কথা ঘুণাক্ষরে আমাকে না জানিয়ে আমারই অলক্ষ্যে এসেছে লা স্পেজিয়াতে ! আশ্চর্য !

আমি রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, এখানে বাস করে এবং যাকে আমি গ্রেপ্তার করতে এসেছিলাম সেই কাউন্ট সিজারো সারভিয়েত্তিকে কি করেছেন আপনারা ?

কমিশনার এররিকো তীক্ষ্ণভাবে আমার পানে তাকালেন, বললেন, লা স্পেজিয়াব মিঃ দোসি আপনি, এটা আমার জানা উচিত ছিল।

বলে তিনি স্বয়ং যেন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হলেন, কিছুটা ইতস্তত করে ফের বললেন, আমরাও লোকটাকে খণ্ডিত রমণীর হত্যাকারী বলে সনাক্ত করেছিলাম। আমরা গতকাল সারভিয়েত্তিকে গ্রেপ্তার করেছি। সে এখন রোমের রেজিনা কোয়েলি কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে।

আচ্ছা, ব্যাপার তাহলে এই ! অথচ কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি

ভেবেছিলাম এই লা স্পেজিয়ার পুলিশ হিসেবে এই কুখ্যাত খুনীকে গ্রেপ্তার করবার সৌভাগ্য আমাদেরই হবে। কিন্তু রোম আমাদের আগে এসে সেই প্রশংসনীয় কার্যের গৌরব কেড়ে নিল।

কমিশনার ও আমি এই কেস সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। তাতে বুঝলাম খুনী সন্ধানে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করেছিল। রোমের জনৈক ডিটেকটিভ প্রস্তাব করে যে, এ ঘটনার সূত্র হয়ত দৈনিক পত্রিকার পাত্রপাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের মধ্যে মিলতে পারে। তারা তাই পরিশ্রমসাধ্য পুরনো পত্রিকার উক্ত বিজ্ঞাপন স্তম্ভ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে যেতে থাকল। প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু নোট নিতে লাগল।

ডিটেকটিভরা তখন বিবাহেচ্ছু স্ত্রী সন্ধানে ব্যস্ত এমন প্রচুর সংখ্যক হবু বরদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। কিন্তু কোন ফল দর্শাল না তাতে।

অবশেষে একটি পুরনো পত্রিকার বিজ্ঞাপনের প্রতি পরম অধ্যবসায়ী জনৈক ডিটেকটিভের নজর পড়ল। লা স্পেজিয়ার অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বিবাহেচ্ছু হয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের ধরন দেখে সন্দেহ জাগ্রত হল। বিজ্ঞাপনটি এরকম :

"একজন অভিজাত ধনী, যুবক নয় কিন্তু অথচ সহৃদয় ও ভদ্র মানুষ সাংসারিক বন্ধনমুক্ত যুবতীদের কাছ থেকে বিবাহের ব্যাপারে পত্রালাপপ্রার্থী।"

রোমের পুলিস তিরিশ বছর বয়সের একজন হাউসকীপার মেয়ের নভেম্বরের গোড়া থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের যোগ আছে বলে মনে করে।

মেয়েটি নাকি তার অফিস-মালিককে বলেছিল, বিবাহের জন্য সে লা স্পেজিয়া যাচ্ছে একটি বিজ্ঞাপনের উত্তরে। এরপর তার আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় নি। মেয়েটির একটা পা (বাঁ পা) খোঁড়া ছিল। সুটকেসে পাওয়া খণ্ডিত মৃতদেহের মত অবিকল।

সেই 'অভিজাত সহৃদয়' ভদ্রলোকটিকে, লা স্পেজিয়াতে খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি ওদের এবং সঙ্গে সঙ্গে রোম থেকে দুজন ডিটেকটিভ চলে এসেছে লা স্পেজিয়াতে। কিন্তু কমিশনার এররিকো ও তার সহকারী যখন এখানে এসে পৌঁছয়, তার পূর্বেই কাউন্ট সিজারো সারভিয়েত্তি রোম রওনা হয়ে গেছে। সেখানে এক হোটেল থেকে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ডিটেকটিভ দুজন ফের ফিরে আসে লা স্পেজিয়ার সেই ঘরে যেখানে খুনী বিজ্ঞাপনে টোপ গেলা মেয়েদের সাদর অভ্যর্থনা করে পরে হত্যা করে ফেলত।

আগেই বলেছি যে, আমার পক্ষে খুনীকে গ্রেপ্তারের পরিবর্তে রোমের কমিশনারকে এর দ্বারা গ্রেপ্তারের অভিজ্ঞতাটা প্রকৃতই তিক্ত। অবশ্য ঐ কেসের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণাদিই আমি প্রদান করেছিলাম এইটুকুই যা সান্ত্বনা। তারই ফলে খুনীর শেষ খুনের কাহিনী অর্থাৎ সেই হাউসকীপার মেয়ে পাওলিজা লোরিয়েত্তির হত্যাকাহিনী প্রমাণিত হয়। এবং আসামী দণ্ডিত হয়। বিবাহ করব বলে মেয়েটার সর্বস্ব লুট করে তাকে কেটে কেটে হত্যা করে।

আরও তিন চারটি মেয়ে হত্যার কাহিনী ঐ কেসে প্রমাণিত হয় এর সঙ্গে তুলনা করা যায় আমেরিকার দানবী মেয়ে বেলি জিননেসের সে-ও বহু যুবককে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ফার্মের ভেতর শুয়োর কাটা ঘরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলত।

যাই হোক আজ ইটালীতে মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়েছে। তখন মুসোলিনীর আমলে তা সামরিক কায়দায় ছিল।

বহুকাল পরে এক সকালে সিজারোকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। যতক্ষণ না রাইফেলগুলি গর্জে ওঠে ওর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়, ততক্ষণে সে কৃপা প্রার্থনা করে জীবন বাঁচাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে যাচ্ছিল। অবশেষে সব শেষ।

বাদালোনার শব
(ম্যাড্রিস স্পেন)

মাদ্রিদের পুলিস চীফ ডন ভিনসেন্টি রেগুয়েনসো বলে গেলেন তাঁর কাহিনী ঃ

এমন নয় যে ছোট ছোট ভুলের মানে বোঝা যায় না, তবে সেই ক্ষুদ্র সহজ সরল ভুলের সংশোধন করাটাই অনেক সময় হয়ে ওঠে খুবই দুরূহ। ধরুন আপনি যদি কোনো মিথ্যা সংবাদ পেয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে ভুল পথে পা বাড়ান, এবং আপনি যদি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটাররূপে কোনো হত্যা রহস্যের সমাধান অভিলাষী হন তাহলে অবশ্যই আপনাকে জটিল অবস্থায় পড়তে হবে। অনেক সময় চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়াও অসম্ভব নয়।

শুরু থেকেই 'বাদালোনার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে' আমার মনে হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে যা অনুমান করা হচ্ছে আসলে সেটা মোটেই তা নয়। সেটা প্রকৃতই যে একটা হত্যাকাণ্ড সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, তবে তার এলোমেলো উল্টো-পাল্টা কিছু সূত্রে আমি বিরক্ত ও বিব্রত হ য়ছিলাম ঠিকই।

ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩২-এর শেষাশেষি। সংবাদে প্রকাশ সে সময়ে বার্সিলোনার নিকটবর্তী বাদালোনা নামক স্থানে একটি ভিলার মেঝের তলায় আবিষ্কৃত হয় জনৈকা যুবতী নারীর মৃতদেহ। বোধকরি যুবতীটিকে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায়, প্রায় মাসখানেক পূর্বে খুন করা হয়েছিল। মৃতদেহ এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে তা সনাক্তকরণের সাধ্য ছিল না, তবে সেই নারীর বয়েস অনুমান করা হয়েছিল তিরিশ বছরের মত।

রাস্তার নাম, অ্যাভেনিদা দ্য নুয়েস্ত্রা সেনোরা দ্য লার্উর্ডেস। একতলা ভিলা। বাড়ির মালিক অ্যান্তনীয় ক্যারেরা জুনকোসা নামক

জনৈক ব্যক্তি নাকি মাস তিনেক পূর্বে এই ভিলা ভাড়া দেয় অউরোলিয় মার্তিনেজ নামের একজন লোককে, যে নিজেকে আর্জেন্টিনাবাসী বলে পরিচয় দান করে। পরে জানা যায় লোকটি স্পেনের হুয়েস্কা নামক স্থানের অধিবাসী, আর্জেন্টিনার নয়।

এই মৃতদেহ আবিষ্কার করবার মাসখানেক পূর্বে এই লোকটি বাড়ি ত্যাগ করে বাড়িওয়ালার হাতে চাবি ফেরৎ দিয়ে চলে যায়। ক'দিন বাদে জুনকোসা নিজ বাড়িটি দেখতে আসে এবং ঘরের ভেতরকার পচা গন্ধই শুধু পায় না, লক্ষ্য করে দেখে যে মেঝের মাঝখানের কয়েকটা টালি যেন কেমন খাপছাড়া ভাবে বসানো রয়েছে। সে পুলিসে সংবাদ দিতে স্থানীয় একজন একজামিনিং ম্যাজিস্ট্রেট মেঝের সেই নির্দিষ্ট অংশটা খুঁড়ে ফেলবার আদেশ দেন। তার ফলে নিপুণ হাতে সেলাই করা একটা বস্তার মধ্যে উক্ত নারীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়।

মৃতদেহে জড়ানো ছিল শুধুমাত্র ড্রেসিং গাউন। সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত কিংবা শ্বাসরোধ অথবা এই দুই কারণেই মৃত্যু হয়েছে নিহতা রমণীর। যে ডাক্তার শব পরীক্ষা করেছিল তার মতে নিহতার বয়েস তিরিশ বছর।

যখন আমি এই কেস-এর তদন্তের ভার নিয়ে যাই তখন বাদালোনায় একটা বিষাদের ভাব বিরাজ করছিল। শহরতলীর স্বল্প কয়েকটি ভিলা অধ্যুষিত স্থানের জীবনযাত্রা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এত নিস্তব্ধ অঞ্চল আমার ভাল লাগছিল না মোটেই। খুন-ভিলাও আমার কাছে খুব বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। যে ঘরে শবদেহ পাওয়া যায় তার বাতাস ও বমনোদ্রেককারী। বিরাট গর্তের কবর খোঁড়া হয়েছিল মেঝেতে।

ঘর তল্লাসী করে একটা জঞ্জাল স্তূপের তলায় পেলাম এক বাণ্ডিল পোশাক, যার কিছুটা রক্ত-মাখা, একজোড়া চশমা, একটি হ্যাণ্ডব্যাগ। সবই সেই নিহতা রমণীর। যে খুনীর খপ্পরে সে পড়েছিল তার এটাই

সর্বপ্রথম খুন নয় বলেই আমার প্রতীয়মান হল। স্থানীয় গুজবে এই কথা প্রকাশিত হল যে ওখানে আরো মৃতদেহ পাওয়া যাবে। কিন্তু সে সমস্তই অলীক রটনা। এর উল্লেখ করলাম এ জন্যে যে এ কেসটা ছিল সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য গোলমেলে এক ধাঁধা বিশেষ।

সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হল এই যে, শবব্যবচ্ছেদ কার্যটি খুবই হেলায় ফেলায় ওপর ওপরভাবে করা হয়েছিল এবং উক্ত ডাক্তার নিহত রমণীর বয়েস বলেছিল ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে। এর ফলে ঐ বয়সের বহু নারীকেই মনে হল এই নিহত রমণী। অযথা খাটুনি বাড়ল, প্রতিটি নির্দিষ্ট নারীর সম্বন্ধে খোঁজখবর তদন্ত করবার জন্য। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেই সেই নারীদের জীবিত অবস্থায়ই পাওয়া গেল।

প্রতিটি ডিটেকটিভের সবচেয়ে আগে ও অল্প সময়ের মধ্যে খুনীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বের করাই প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। অথচ এক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত কোন ধারণায় আসতে পারছিলাম না, কেন না আমাদের সন্দিগ্ধ ব্যক্তি অউরেলিও মার্তিনেজ-এর জীবন-যাপনের পূর্বাপর কোন ধারণা আমার ছিল না। লোকটি ছমাস পূর্বে বাড়িটি ভাড়া করে। প্রতিবেশীদের কাছে জানা গেল, সন্ধ্যার পূর্বে লোকটিকে কখনোই বের হতে দেখা যায় নি। যুবক যুবক দেখতে লোকটা শান্ত-কোমল স্বরে কথা বলত। ছিপছিপে ও বেঁটে চেহারার ঐ মানুষটির নাকি পোশাক-আশাক এবং সৌন্দর্যের দিকে খুবই নজর ছিল।

আমি তার আইডেন্টিফিকেশন কার্ড পরীক্ষা করে দেখলাম। স্বাক্ষরটি অতীব সতর্কতা সহকারে করা হয়েছে তাতে। যাতে আমার এ ধারণা নিশ্চিত হল এটা ওর আসল নাম কখনই নয়। অনেকে হাতের লেখার ওপর আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না, আমি অবশ্য সে-ধরনের মানুষ নই। দেখা গেল কার্ডের যাবতীয় সংবাদই মিথ্যা, ঠিকানা হিসাবে একমাত্র ১০নং ক্যালে ছ টলার্স, বার্সিলোনা কথাটি ছাড়া।

আমি সেই ঠিকানায় গিয়ে বাড়িউলিকে প্রশ্ন করলাম, অউরেলিও মার্তিনেজ নামক কোন ব্যক্তি তার বাড়িতে কখনো বসবাস করত কিনা। সে তার স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। বাড়িওয়ালা জানালে, অমন নামের কারুর কথা তার আদৌ জানা নেই। পরে যখন লোকটির চেহারার বর্ণনা দিলাম তখন সে বলে উঠল, ওহো, হ্যাঁ হ্যাঁ এ যে বেঞ্জামিন বালসানো নামের লোকটির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঐ নামের একজন লোক এখানে বাস করত বটে সামান্য কিছুকালের জন্য। সে বেশ চুপচাপ ধরনের মানুষ ছিল, আর খুবই খাপছাড়া জীবনযাপন করত। প্রায়শই সে অভাবের মধ্যে দিন কাটাত। মনে আছে একসময় সে আমায় বলেছিল, বারসিলোনার বাইরে তার নাকি একটা ভিলা আছে।

আমাদের রেকড ঘেঁটে দেখলাম এই বালসানো একজন চোর, বহু শহরেই পুলিসের খাতায় ওর নাম আছে। লোকটা পাক্কা জুয়াড়ী এবং তঞ্চক ও প্রবঞ্চক। এই ধরনের মানুষদের কখনো সচ্ছল এবং কখনো অভাবী জীবনযাপন করতেই হয়। বালসানো ও মার্তিনেজ যে একই এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি একথা প্রমাণ করতে আমার খুব অসুবিধে হল না। কারণ উক্ত ভিলার মালিক ও প্রতিবেশীদের ওর ফটোগ্রাফ দেখাতে সবাই চিনতে পারল ওকে।

এই সময়ই আমি ইচ্ছে করলে ওয়ারেন্ট বের করে ওকে গ্রেপ্তার করতে পারতাম কিন্তু আমি তখন নিহত রমণীর সনাক্তকরণে সমর্থ হইনি, এবং আরও কিছু তদন্তকার্য তখনও বাকি ছিল, তাই ও-কাজে বিরত রইলাম।

আমি ইতিমধ্যে জানতে পারলাম যে এই বালসানো বার্সিলোনা শহরে কৃষ্ণকেশী স্থূলাঙ্গী একটি রমণীকে নিয়ে ওঠাবসা করত। বিবাহিতা সেই রমণীর নাম ইউলেলিয়া মাইনু। তাকে নিয়ে ক্যালে ডু লা ক্যান্দনা অঞ্চলে একটি ঘর ভাড়া করে কিছুদিন বসবাসও করেছে। বালসানো এবং সেই রমণীটি সহসা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

কেউ বলতে সক্ষম নয় কোথায় গেলে দেখা মিলবে তাদের।

ইউলেলিয়ার বাড়ি ছিল গ্র্যানোলার্সে। আমি সেখানে গিয়ে ওর সৎ মায়ের সঙ্গে দেখা করি। আমার আগমন দেখে সৎমা যেন একটু ভড়কে গেলেন অজানা আশঙ্কায়। বাড়িতে কয়েকটা চিঠির টুকরো পেলাম, সেগুলো জুড়ে পাঠোদ্ধার করে বোঝা গেল, ইউলেলিয়া লিখেছে, সে একজন বন্ধুর সঙ্গে বার্সিলোনা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সৎমাকে লিখেছে পড়বার পরে সে যেন তার এ চিঠি নষ্ট করে ফেলে। পত্রে তারিখ ছিল ১৯৩২-এর ২৩শে মার্চ। বাদালোনাতে মৃতদেহ আবিষ্কারের ঠিক দুদিন আগের তারিখ।

ইউলেলিয়ার সঙ্গে বালসানোর ঘনিষ্ঠতা এই কেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বলা যায়। কিন্তু এর চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় হল নিহত রমণীর পরিচয় বের করা। আমি শবব্যবচ্ছেদে খুশী ছিলাম না। অথচ ডাক্তার তার অভিমত পালটাতে কিছুতেই রাজি নয়। সে এখনো দৃঢ়ভাবে বলছে নিহতার বয়স তিরিশের ওপরে কিছুতেই নয়। তখন আমার মনে হল ক্যালে ছ টলার্সের বাড়িটিই আমার অতৃপ্ত প্রশ্নাদির যথার্থ উত্তর সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। তাই কাল বিলম্ব না করে সোজা সেখানে চলে গেলাম। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ফের আলোচনা শুরু করলাম।

বাড়িওয়ালা কথা প্রসঙ্গে জানাল যে বালসানো একদা এ বাড়িতে এম্মি ল্যাঙ্গার নাম্নী জনৈকা জার্মান নারীর সঙ্গে বসবাস করেছিল। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বিধবা পত্নী সেই মহিলার বয়েস ছিল প্রায় ষাট। অবস্থা তার ভালই ছিল কিন্তু মহিলাটি অত্যধিক মদ্য ও ড্রাগ আসক্তা ছিল। শোনা যায় তার মূল্যবান জুয়েলারীও ছিল প্রচুর। সে একটি তোতাপাখী ফেলে রেখে গেছে, যে জার্মান ভাষায় কিছু কথা বলতে পারে। আমি গিয়ে দেখলাম মালিকের অনুপস্থিতির জন্য পাখিটির অতীব দুরবস্থা হয়েছে। জার্মান ভাষা জানা একজন লোক নিয়ে গেলাম পাখিটির কাছ থেকে কোন কথা বার করা যায় কিনা দেখতে।

দেখা গেল, পাখিটি সাধারণ কথার চেয়ে খিস্তি-খেউড়ই বেশী করে। কোন লাভ হল না।

এতক্ষণে আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি যে বালসানো ঐ ল্যাঙ্গারকেই হত্যা করেছে। বাদালোনায় প্রাপ্ত কিছু ফার্নিচার দেখা গেল এ মহিলাটির। খুঁজে খুঁজে পুরনো পোশাক কেনা-বেচা করে এমন একজন দোকানদারকে বের করে দেখলাম, বালসানো তার কাছে ঐ মহিলার কিছু পোশাক বিক্রী করেছে। এখন আমার প্রমাণ করা প্রয়োজন যে মৃতদেহটি এই মহিলারই, কোন তিরিশ বছরের তরুণীর আদৌ নয়। এ ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান। আবিষ্কার করলাম যে উক্ত জার্মান মহিলাটির পায়ে একটা ঘায়ের জন্য একদা অপারেশন করা হয়েছিল, এখন মৃতদেহটি পুনঃপরীক্ষা করালে অবশ্যই সেই শল্য চিকিৎসার চিহ্ন পাওয়া যাবে। আমারই উপরোধে ফের শব পরীক্ষা করে সেটা প্রমাণিত হল এবং আরও প্রমাণিত হল যে মহিলাটির বয়স প্রকৃতই ষাট, তিরিশ নয়।

এবার বালসানো ও তার রক্ষিতাকে ধরে আনা দরকার। পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপা হওয়ায়, অচিরেই ওদের দুজনকে ম্যাড্রিদের ল্যাভেসিস অঞ্চলে গ্রেপ্তার করা হল। ওর কাছে পাওয়া গেল এই খুনের ব্যাপার সম্পর্কে সংবাদপত্রের কাটিং এবং যে ঘরে মৃতদেহ পুঁতে রেখেছিল সে ঘরের একটা প্ল্যান।

গ্রেপ্তারে কিন্তু বালসানো এতটুকু ঘাবড়ালো না। খুনের অভিযোগ সে সরাসরি অস্বীকার করতে পারলনা কিন্তু সে বলল, এম্মি ল্যাঙ্গারকে চিনি না। খুনী হিসেবে সে নাম করল অপর একজন সহকর্মী ক্রিমিনালের। যখন আমি তাকে বললাম, যে সে লোকও খুনের সময় জেল খাটছিল অন্য এক অপরাধে, তখন যেন বালসানো সত্যি সত্যিই বিচলিত হয়ে গেল। তবু সে ভাঙল না দেখে তাকে অপরাধ অনুষ্ঠানের সেই ঘরটিতে বহুবার নিয়ে যাওয়া হল। প্রতিবারই যদিও তার মুখভাব পালটে যেত এবং ফ্যাকাশে হয়ে উঠত, এতদসত্ত্বেও সে

যে খুনী একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে যেতে লাগল।

এম্মি ল্যাঙ্গারকে ঐ ভিলাতে হত্যা করা হয় নি। তাকে খুন করা হয়েছিল ক্যালেন্ড টলার্সের বাড়ি ছেড়ে এসে বার্সিলোনার অপর এক বাড়িতে। তিনদিন বাস করবার পর ওখানকার একজন পরিচারিকা দেখে যে বালসানো বিরাট একটা সুটকেস বহন করে নিয়ে চলেছে এবং তার ভেতর থেকে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। বালসানো তাকে কৈফিয়ত স্বরূপ জানায় যে সে একাই চলে যাচ্ছে, সঙ্গিনী জার্মান মহিলার অসুখ করেছে বলে সে আর গেল না।

—আপনার সুটকেস থেকে কিসের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে? পরিচারিকা সরল মনে প্রশ্ন করে।

—আর বলো না। গন্ধটা সসেজের। সসেজগুলো বোধকরি পচে গেছে। তারই দুর্গন্ধ।

বালসানো সুটকেসটা নিয়ে পূর্বোক্ত ভিলায় এসে আশ্রয় নেয়। বলা বাহুল্য সুটকেসের মধ্যে ছিল এম্মি ল্যাঙ্গারের মৃতদেহ। পরে বাক্সটা পরীক্ষা করে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল পেরেকে লেগে থাকা মহিলাটির পোশাকের কিছু সুতো।

ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছিল যখন বালসানো বুঝতে পারল তার প্রত্যাশা অনুযায়ী আদৌ কোন অর্থ নেই এম্মি ল্যাঙ্গারের কাছে। এম্মি তখন মদ্যপান করছিল, ঝগড়ার মুখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। তখন উন্মত্ত হয়ে বালসানো একটা ছুরি তুলে নিয়ে মহিলাটির গলা কেটে দেয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। মারাত্মক আঘাত করেছে কিনা সে বিষয়ে তখনো নিশ্চিত না থাকায় বালসানো এরপর কয়েকটা সিল্কের মোজা দিয়ে স্ত্রীলোকটির গলায় ফাঁস লাগায়, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। অতঃপর মৃতদেহ কিভাবে সে লুকিয়ে ফেলবে সে বিষয়ে গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করে।

প্রথমে বালসানো ঠিক করেছিল ভিলা সংলগ্ন বাগানে পুঁতে ফেলবে মৃতদেহ। কিন্তু যে রাত্রে সে চেষ্টা করতে যায়, একজন বিটের

পুলিস তাকে দেখে ফেলে বাগানে, অতএব সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় পরে এম্মিকে মেঝের টালি তুলে সমাধি দেওয়া হয়।

বার্সিলোনার ফৌজদারী আদালতে ওকে এবং ইউলেলিয়া মেইনুকে হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। সে তখনো নিজেকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে এবং বলে তাকে যদি এভাবে বিচার করা হয় তবে ধর্মাধিকরণ একজন নিরীহ নির্দোষ মানুষকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেবে। ইউলেলিয়া বেকসুর খালাস পায়। বালসানোর খুন ও ডাকাতির অভিযোগে কুড়ি বৎসর এবং মিথ্যা দলিলপত্র দাখিল করার জন্য আরো দু'বছর, একুনে বাইশ বছরের জেল হয়ে যায়।

বালসানো যখন জেল খাটছিল তখন ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। বার্সিলোনার সেই সময়কার হৈ-হট্টগোলে সে অপরাপর বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি পেয়ে যায়।

পুনরায় ১৯৫৫-তে অপর এক অপরাধের অভিযোগে ফের সে জেলে গিয়ে ঢোকে। আজও সে জেলেই আছে।

লিঞ্চিং-এর বীভৎস কাহিনী
(ওয়াশিংটন)

ওয়াশিংটনের পুলিস ক্যাপ্টেন জন কোনালী বললেন ঃ

আমি সেই মুখোশধারী মানুষগুলোকে বহুকাল পূর্বেই দেখেছিলাম। তারা ঝকমকে শ্বেতশুভ্র পোশাকে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। সন্ধ্যের আলোতে তাদের যেন দেখাচ্ছিল মূর্তিমান অশ্বারোহী শয়তান বিশেষ। তখন আমি বালক মাত্র, বাস করতাম মেরীয়ানা নামক স্থানে। সেই শিশু বয়সের বিভীষিকা স্বরূপ আজও মনে পড়ে তারা এসে আমাদের ক্যাথলিক চার্চের সামনে ভয়ঙ্কর একটা ক্রুশ পুঁতে দিয়েছিল। তারপর গীর্জার ভেতরকার প্রার্থনারত নরনারীদের সগর্জনে বাইরে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিল। ছোট হলেও আমার বুঝতে বাকি ছিল না যে ওরা এবার চার্চে আগুন ধরিয়ে দেবে।

লুক্কায়িত মুখ এইসব দুর্বৃত্তরা ক্যাথলিকদের, নিগ্রোদের এবং ইহুদীদের নিদারুণ ঘৃণা করত। শ্বেতাঙ্গ এবং দক্ষিণ দেশীয় ছাড়া যাবতীয় মানুষদের প্রতি এদের ঘৃণা বর্ষিত হত বীভৎস ভাবে। এদের নাম ছিল 'দি কিউ ক্লাক্স ক্ল্যান'। এরা বহুকাল ধরেই আমাদের গ্রামসমূহে এবং মাঠে যারা কাজ করত তাদের মধ্যে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। সেই শৈশবের বিষাক্ত স্মৃতিসমূহ চিরস্থায়ী দাগ কেটে গিয়েছিল মনে। যদিও তারপর অর্ধশতাব্দী কেটে গেছে তবু সেই ভয়াবহ রাত্রিব ঘটনা আমার মনে এখনো স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে।

পরবর্তী জীবনে এদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি, শুনেছি। এই 'কিউ ক্লাক্স ক্ল্যান' দল কিভাবে সর্বপ্রথম গঠিত হয়েছিল সেই সিভিল ওয়ারের সময় এবং কিভাবে ক্রীতদাস প্রথা রহিত হবার পর দুর্নিবার দুর্দম দলে পরিণত হয়েছিল। সেযুগে ওদের খেলা ছিল অজ্ঞানতা, আতঙ্ক সৃষ্টি এবং কুসংস্কার নিয়ে। তখন বহু নিগ্রোই

জানতো এবং বিশ্বাস করতো যে 'ক্লাক্স'-এর লোকেরা অলৌকিক শক্তিধর শ্বেতাঙ্গ প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কলেজ জীবনে এদের বিষয় আরও অনেক কিছু পরে জানলাম: এদের অদ্ভুত আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড, কঠোর মৃত্যুশপথ। এরা যদি কেউ এদের নাম বাইরে ফাঁস করে দেয় তাহলে তার প্রতি যে অমানুষিক হিংস্র শাস্তি নেমে আসে, তার কথা। সে সব অতীব বীভৎস কর্মকাণ্ড। এদের সব টাইটেলও চমৎকার, যেমন গ্র্যাণ্ড ইমপিরিয়াল উইজার্ড কিংবা মোঘল। এইসব প্রধানের অধীন একদল কঠোর নিষ্ঠুর চরিত্রের লোক ধর্মীয় এবং জাতীয় ঘৃণাতে নিদারুণ ভাবে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছিল।

এর বহুদিন বাদে আমি বড় হয়ে যখন চাকুরী জীবনে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটার হিসাবে সাফল্য অর্জন করেছি, তখন এদেরই হিংস্র কর্মকাণ্ডের এক তদন্তের ভার এল আমার হাতে। ওয়াশিংটন থেকে আমাকে পাঠানো হল কুখ্যাত ঐ কিউ ক্লাক্স ক্ল্যানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে। আমি জানতাম এবং স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে আমি এই অ-আমেরিকান গুপ্ত সোসাইটিকে কফিনে পুরে জন্মের মত খতম করে দিয়ে আসব। অন্তত এটাই ছিল আমার আন্তরিক সংকল্প।

১৯৩০ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম ইণ্ডিয়ানা রাষ্ট্রের ম্যারিয়ন নামক স্থানে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস মনে হয়, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষীদের ধরতে এলাম, সেটাই একদা নিগ্রোদের অত্যাচারী প্রভুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে যাবার একটি প্রকৃষ্ট স্থানরূপে চিহ্নিত ছিল। ম্যারিয়নের ঘটনা বা দুর্ঘটনার বিবরণ দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। ঘটনার শুরু ও শেষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়। এর শুরু হল নিকটবর্তী ফেয়ারমণ্ট নামক স্থানে একটি তরুণ যখন গিয়ে আঠারো বছর বয়স্কা তার গার্ল ফ্রেণ্ড এর সঙ্গে মিলিত হয় ম্যারিয়নে। দুজনে মিলে সিনেমা দেখে, পরে কিছু ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে যায় মিসিসিনেওয়া নদী তীরের এক নির্জন নিরালা স্থানে। সেখানে গাড়ি থামিয়ে দুজনে চুম্বনে

আলিঙ্গনে প্রেমকরণে মত্ত হয়ে উঠে। এই রকম রসঘন আনন্দ মুহূর্তেই সহসা নেমে আসে অকল্পনীয় সেই বিপত্তি।

অকস্মাৎ তাদের গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ায় এসে একটি ছায়ামূর্তি, কৃষ্ণাঙ্গ এক নিগ্রো, এই প্রেমিকযুগলের পানে হাতের আগ্নেয়াস্ত্র নিশানা করে কর্কশ ও কঠোরকণ্ঠে বলে ওঠে—দিস ইজ এ স্টিক আপ, কিডস। নিজেদের মঙ্গল চাও তো নেমে এস গাড়ি থেকে।

আদেশ মত বোবা হয়ে যাওয়া শ্বেতাঙ্গ প্রেমিক যুবকটি তন্মুহূর্তে গাড়ি থেকে নেমে আসে, মেয়েটি তখন ভেতরে। পিস্তলধারী ইসারা করতে অদূরে অন্ধকারে দাঁড়ানো আরও দুজন নিগ্রো এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। নেতা বললে, মেয়েটার ব্যবস্থা কর।

একজন ঢুকে পড়ল গাড়িতে, পরক্ষণেই মেয়েটির ধ্বস্তাধ্বস্তি ও আর্তচিৎকার ভেসে এল প্রেমিকটির কানে। শুনে সে স্থানকালপাত্র, ভয় ভীতি আশঙ্কার কথা বিস্মৃত হয়ে দুঃসাহসিক এক কাজ করে বসলো। বজ্রমুষ্টির প্রচণ্ড একটি ঘুষি হাঁকড়াল সেই অস্ত্রধারী নেতার মুখে। কিঞ্চিৎ টাল খেয়ে গিয়েও সেই নিগ্রো নেতা পিস্তল দিয়ে তিন তিন বার গুলি করল। হাতে ও পাকস্থলীতে গুলি খেয়ে প্রেমিক ছেলেটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, ফিনকি দিয়ে গরম রক্ত ছুটল চারদিকে।

তিনজন দুর্বৃত্ত এবার ছুটে গেল তাদের পুরনো মডেলের টি ফোর্ড গাড়ির পানে এবং মিনিটের মধ্যে দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

মেয়েটি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার জ্ঞানহারা দয়িতের দেহ ধরে। তারপর সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কাছাকাছি কেউ নেই, কারুর কানে গেল না সে চিৎকার। তখন সে দৌড়ে গেল বেশ খানিকটা দূরের এক ফার্ম হাউসে। রাত তখন ১০-২০ মিনিট।

ঘটনার তদন্তের ভার পড়ল একজন শেরিফ-এর হাতে। নাম তার জ্যাক ক্যাম্পবেল, অত্যন্ত সাহসী এবং দক্ষ পুলিস অফিসার।

হাসপাতালের ডাক্তাররা মরণোন্মুখ তরুণটিকে বাঁচাবার জন্যে মরণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি পুলিসের কাছে ঘটনার যথাযথ বিবৃতি দিয়েছে। দুর্ঘটনার রাত্রে ক্যাম্পবেল ম্যারিয়নেই ছিল। তার নজরে পড়েছে একটা পুরনো মডেলের টি-ফোর্ড গাড়ি নিয়ে তিনটি নিগ্রো ছেলে ওয়াশিংটন স্ট্রীট দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে। তাদের গাড়ি চালাবার ধরন ধারন ভাল লাগেনি শেরিফ-এর। সেই নিদারুণ ডিপ্রেশন-এর যুগে কি কৃষ্ণাঙ্গ কি শ্বেতাঙ্গ সব মানুষই কেমন দিশেহারা হয়ে কমবেশী উন্মত্তের মত আচরণই করত। অতএব নিগ্রো ছেলেগুলির এলোমেলো ব্যবহারে পুলিস অফিসার তেমন গা দিল না। তবু অভ্যেসবশতঃ সে ঐ গাড়িটির নম্বর নিয়ে নিল। পরে অফিসে গিয়ে দেখল টম শিপ নামক এক ব্যক্তির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত সেই গাড়িটা।

ক্যাম্পবেল এরপর হোয়াইট ও ওয়েলস্ নামক দুজন সহকারী সঙ্গে নিয়ে সেই টম শিপের ঠিকানা অনুযায়ী শহরের কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চলে চলে গেল।

আধো আলো আধো ছায়ায় থাকা রংহীন একটি অতি জীর্ণ কাঠের তৈরী কুটীরের সামনে এসে তারা থামল। পাশের গ্যারেজেই তারা সেই গাড়িটিকে পেল। গাড়িতে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ ও ঘাসের চিহ্ন দেখতে পেল, সেগুলো অধিক পরিমাণে জন্মায় মিসিসি-নেওয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে।

বাড়িতে ঢুকে পর্দা সরিয়ে ক্যাম্পবেল দেখল, বিছানা না পাতা একটা খাটে পোশাক পরা অবস্থায়ই টম শিপ ঘুমিয়ে রয়েছে জড়ো-সড়োভাবে। জাগাবার পর সে জানাল, দু'জন বন্ধুসহ সে গাড়ি নিয়ে একটু আমোদ-ফুর্তি করতে বেরিয়েছিল। বন্ধুদের নাম অ্যাবে স্মিথ এবং হার্ব ক্যামেরণ। শিপকে নিয়ে বেরিয়ে পুলিশ অফিসার তার বন্ধুদের অচিরেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল।

আবে স্মিথ ১৯ বছরের ছেলে আর ক্যামেরণ হল অপুষ্টিজনিত শীর্ণাকৃতি ১৫ বছরের এক কিশোর। তাদের হাতকড়া দিয়ে জেল

হাজতে নিয়ে যাওয়া হল, লাল ইট পাথরে তৈরী ম্যারিয়ন কারাগারে।

নদীতীরে এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করবার সময় ক্যাম্পবেল আমাকে অনেক কিছুই জানাল, কিন্তু নিগ্রো বালক তিনটির প্রতি গ্রেপ্তারের পর কি ধরনের অত্যাচার হয়েছিল তা আমাকে ভালভাবে জানানো হয়নি। শোনা যায়, তাদের নাকি প্রচণ্ড প্রহার দিয়ে অর্ধমৃত করে ফেলা হয়েছিল সেইরাতে। কেউ কেউ বললে, নিগ্রো আসামীদের মারতে মারতে প্রায় শেষ করে ফেলা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের পূর্বপর্যন্ত। টম শিপ আক্রমণের কথা স্বীকার করে, অপরজনও টমের সঙ্গী ছিল সে সময় একথা জানায়।

ঠিক সেই রাত দুটোয় তখন ম্যারিয়নের উপকণ্ঠে এক জরুরী মিটিং হয়ে যায় কিউ ক্লাক্স ক্ল্যান দলের। বে-আইনী জিন মদের বন্যা বয়ে যায় সে সভায়। সেখানেই প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে যায় জেল আক্রমণ করবার, জেল ভাঙবার। মিটিং শেষে দেখা গেল অধিকাংশ সদস্যই চুর-মাতাল হয়ে গেছে। স্থিরিকৃত কুকর্মটি করবার জন্য অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে তারা। স্থির হল, তাদের আসন্ন অভিযানে সামিল হবার জন্য জেলার সমস্ত সভ্যদের আহ্বান করবে। 'নিগ্রো হারামজাদাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব'—এই কঠোর শপথ ধ্বনিত হল রণহুংকারে।

বেলা দশটার সময় এক বিশাল জনতা এগিয়ে গেল জেল-হাউস এলাকায়। শহরের বাইরে থেকেও দলে দলে লোক এসে মিশে যাচ্ছে সেই জনস্রোতে। আসন্ন গুরুতর হিংসাশ্রয়ী বিপর্যয়ের আশংকায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

কর্তৃপক্ষ থেকে ক্যাম্পবেলকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বলা হল, জেলের সামনের মারমুখী জনতার উদ্দেশ্য গুরুতর। খুব সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধি-কৌশলে মোকাবিলা কর। আর বন্দী তিনজনকে ম্যারিয়নের বাইরে নিয়ে চলে যাও এখুনি।

শেরিফ ক্যাম্পবেল অন্য ধাতের মানুষ, সে তার নিজস্ব শক্তিমত্তা

সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন। সে জবাব দিল, ও কাজ করলে লোকে ভাববে ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে গেছি। সে বান্দা আমি নই। এখানকার জেল-বাড়ি এ অঞ্চলের মধ্যে খুবই সুগঠিত ও সংগঠিত। কারুর সাধ্য নেই এটা ভেঙে ভেতরে ঢোকে।

ক্যাম্পবেল-এর এই সিদ্ধান্ত যে কত মারাত্মক রকমের ভুল তা অচিরেই প্রমাণ হয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে লিঞ্চ-দণ্ড কার্যকরী হয়ে দুটি শবদেহ রৌদ্রের মধ্যে দড়িবাঁধা অবস্থায় গাছে ঝুলতে লাগল।

জনতা যথারীতি একটা জন আদালত খাড়া করে বিচার কার্য সমাপন করল। তাদের এই অবৈধ বীভৎস রক্তলোলুপ কর্মে বাধা দেবার মত কোন ন্যাশনাল গার্ড ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

ঘটনার আদিতে দেখা গেল মুখোশধারী চারজন 'ক্ল্যান্স' রাস্তার লোহার ট্রাফিক সিগনালের একটা পোস্টকে মাটি খুঁড়ে তুলে নিয়ে এল, পরে অর্গলবদ্ধ ভারী ওক কাঠের জেল দরজায় আঘাত হানতে লাগল তা দিয়ে। প্রচণ্ড মজবুত দরজা সে আঘাতে এতটুকু টলল না। ক্লান্ত হয়ে সে দল তখন কিছুটা জিরিয়ে নিল। তাদের মুখে কঠোর শপথ, আবার কাজে লেগে গেল দরজা ভাঙতে।

একটা টিয়ার গ্যাস বোমা ছোঁড়া হল জেলের ভেতর থেকে জনতা ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে, কিন্তু জনতার একজন, ফাটবার আগেই সেটা তুলে ফের ছুঁড়ে দিল জেল প্রহরীর দিকে।

এদিকে লৌহদণ্ড দিয়ে সমানে আঘাত হানা চলতে লাগল দরজায়। সহসা জনতার মধ্যে চরম বিজয় উল্লাসধ্বনি উত্থিত হল। দেখা গেল দরজার পাশের ইটের গাঁথুনী আলগা হয়ে ভেঙে পড়ছে ক্রমে—চলে এস ভাইরা, হাত লাগাও, শুয়োরের বাচ্ছা নিগারদের সমুচিত শিক্ষা দিতেই হবে। মুখোশধারী একজন চিৎকার করে ওঠে।

মদের বোতল হাত ফেরতা হতে লাগল মুহুর্মুহু। মুখোশধারী দলের নেতার পোশাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লম্বা শক্ত এক দড়ির বাণ্ডিল। প্রচুর লোক এগিয়ে গেল জেল গেট ভাঙতে।

জেলের মধ্যে এতক্ষণে বুঝি শেরিফ ক্যাম্পবেলের বোধগম্য হল যে মারমুখী উন্মত্ত জনতাকে আর কোনক্রমেই রোখা যাবে না। বিশাল জনতা ক্রমেই আরও বাড়ছে। ভালভাবে দেখবার জন্য লোকেরা তাদের গাড়ির চালে উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেক ভীত বিস্মিত শিশুদের জেল গেট ভাঙার মজার দৃশ্য দেখাবার জন্য তাদের কাঁধে তুলে ধরেছে। বহু লোক শুধুমাত্র এই রোমহর্ষক কার্য দেখবার মানসেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে, তারা দুর্বৃত্ত দলের কেউ নয়। সাধারণ নাগরিক জনতা। অনেকে ছিল এ কুকাজের বিরোধী। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করে বা বাধা দেয়।

জেলের দোতলার জানালা থেকে শেরিফ ক্যাম্পবেল মারমুখী জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে ওঠে, থামো—স্টপ ইট নাউ! দরজার দিকে মুখ করা মেশিনগান ফিট করে রেখেছি। যে প্রথমে ঢুকবে সেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

কে কার কথা শোনে! দরজা ভাঙার চেষ্টা উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে এক সময় পাশের দেওয়াল ধ্বসে পড়তে 'কিউ ক্লাক্স ক্ল্যানে'রা জয়ী হয়ে জেলের মধ্যে হুহু করে ঢুকে গেল। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। ধাবমান নৃত্যরত উন্মত্ত জনতা।

হুঁশিয়ারী মত ক্যাম্পবেল কিন্তু আক্রমণকারী জনতার উপর গুলি বর্ষণ করল না। করা সম্ভব ছিল না। সে জানে ঐ বিশাল জনতার মধ্যে রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধব, পড়শী এমন কি দু'একজন হয়তো আত্মীয়স্বজনও। তাকে ভাবতে হল বন্দীদের বাঁচাবার জন্য ডজনখানেক মানুষ মেরে ফেলা উচিত হবে কিনা। কিংবা গুলি চালানো সত্ত্বেও এই নিগ্রো বন্দীদের জনতার হাত থেকে আদৌ বাঁচানো যাবে কিনা।

মুখোশধারী 'উইজার্ড' এসে শেরিফের হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে 'সেলে'র দরজা খুলে ফেলল। দুজন লোক টম শিপকে জাপটে ধরল, নিগ্রোটির তখন প্রায় মূর্ছিত অবস্থা। একজন ধরে রইল,

অপর লোকেরা বৃষ্টির মত কিল চড় ঘুষি চালাতে থাকল বন্দীর সর্বাঙ্গে। তরুণ নিগ্রোটিকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে এনে এক লাথিতে জেল সিঁড়ি থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হল সামনের লনে। এরপর যখন তার গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে দেওয়া হল তখন আর কৃষ্ণাঙ্গ বালকের জ্ঞান নেই।

গাড়ির ছাদে দাঁড়ানো একটি শ্বেতাঙ্গ যুবতী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, হত্যা কর, হত্যা করে ফেল ব্যাটাকে।

চোখের নিমেষে টম শিপের দেহ একটা গাছের ডালে ঝুলতে লাগল। তারপর পিঠমোড়া বন্ধনে অ্যাবে স্মিথকে নিয়ে আসা হল :—'কেমন লাগছে এখন ব্যাটা কুত্তার বাচ্চা কেলে নিগার ?' ব্যঙ্গভরা স্বরে গর্জন করে উঠল একজন বদ্ধ মাতাল। গলায় ফাঁস এঁটে অপর প্রান্ত ঘুরিয়ে আনা হল গাছের ডালের উপর দিয়ে। প্রচণ্ড জয়ধ্বনির মধ্যে প্রাণ হারিয়ে ঝুলতে লাগল সেই নিগ্রো বালকটি।

ষোল বছরের বালক হার্ব ক্যামেরণ একটি স্ত্রীলোকদের 'সেলে'র মধ্যে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচালো। 'আমি চুরির দায়ে দশদিন ধরে জেল খাটছি'—হার্বের এ কথায় বিশ্বাস করে, না কি এই হাড় সর্বস্ব কেলে ছেলেটাকে মেরে দড়ির অপমান হবে ভেবে ওরা ওকে রেহাই দিল, তা জানা যায় নি। এও হতে পারে জনতা হিংসাশ্রয়ী জেল ভাঙা ও দু-দুটো ফাঁসী কাঠের দ্বারা নিজেদের ক্রোধকে প্রশমিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে, তাই হার্ব রেহাই পেয়ে গেল।

এই রোমহর্ষক সংবাদ বিশ্বের চতুর্দিকে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যারিয়নে দলে দলে পুলিশ ও ন্যাশন্যাল হোমগার্ড এসে উপস্থিত হল। কিন্তু তখন 'ক্লাক্সের' লোকেরা বিশেষ করে মুখোশধারীরা হাওয়া হয়ে গেছে।

আমি যখন তদন্তের ভার নিয়ে অপরাধী সন্ধানে সেখানে যাই তখন শহরটির আবহাওয়া খুবই উচ্চগ্রামে অবস্থিত। এটা ভাবা অন্যায় হবে যে স্থানীয় সৎ নাগরিকবৃন্দ এই ভয়ঙ্কর বল প্রয়োগে মর্মাহত

হয় নি। এবং একজন যাজক তার মতামত প্রকাশ্যেই প্রচার করতে লাগলেন, আমরা সত্যের প্রকাশ চাই। যীশুখৃষ্টের নাম নিয়ে বলছি, যারা এই অমানুষিক বল প্রয়োগের দ্বারা সমাজ সংস্কারের মহা অপকার করল তাদের জনতার সম্মুখে অবশ্যই উপস্থিত করা চাই।

ম্যারিয়নে সামরিক আইন জারী হল। প্রায় চার সপ্তাহ ধরে সেখানকার কিছু সংসাহসী মানুষের সহায়তায় ন্যায় বিচারের চাকাকে ধর্মাধিকারণের পথে চালিত করবার চেষ্টায় রইলাম। কিন্তু মুস্কিল হল যে প্রত্যক্ষদর্শীদের তল্লাসী ও জেরা চলা কালে এমন দুজন সাক্ষী পেলাম না যারা কুকীর্তির প্রধান তাদের অন্তত একজনেরও নাম করতে রাজি হয়। কেউই বলতে রাজি না 'আমি অমুককে দেখেছি ঐ নিগ্রোদের গলায় দড়ির ফাঁস লাগাতে। আমি তাকে ভালোভাবেই চিনি। এ ব্যাপারে আমার ভুল হয় না। আমি তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে খুবই পরিচিত'।

গুজব রটল ''ক্ল্যান' লিডাররা জর্জিয়াতে পালিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু করবার ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে অসহায়। তাই রাজ্য সরকার ও পুলিশের হাতেই ন্যস্ত রইল এ কেসের ভার।

জেমস এম অগডেন নামক একজন বেপরোয়া দুঃসাহসী অ্যাটর্নী জেনারেল অবশেষে দুজন 'ক্ল্যান' সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়ে কোর্টে হাজির করান। দুঃখের বিষয় ওদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় মামলা ফেঁসে যায়।

প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেছে আমি ম্যারিয়ন ছেড়ে চলে এসেছি। আমি জানি সে কেসে আমি সম্পূর্ণ বিফল হয়েছি। ইতিমধ্যে দক্ষিণ দেশের সময় ভাল'র পথে অগ্রসর হয়েছে। যদিচ এখনও নিগ্রো বিদ্বেষ সেখান থেকে একেবারে নির্মূল হয়ে যায় নি, তবু অধিকাংশ আমেরিকান আজ সেদিনের আশায় অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছে, যেদিন এই কালা-সাদার হিংসা-দ্বেষ চিরতরে সে দেশ থেকে বিদায় নেবে।

বিকৃত-মানস
(মেক্সিকো)

মেক্সিকোর পুলিস চীফ আরনেস্তা র‍্যামন ল্যাব্রিহো বললেন ঃ

বুলফাইটের মত এমন চাঞ্চল্যকর ক্রীড়া বুঝি বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই! একটি নধর হিংস্র ফুঁসে আসা ষাঁড়কে নিয়ে অসম সাহসী মাটাডোর যখন ক্ষেপাতে ক্ষেপাতে লাল রঙের কাপড়টাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, রিঙের চারধারে দর্শকরা তখন রুদ্ধ নিশ্বাসে নিরবে সে দৃশ্য তন্ময় হয়ে দেখে। তারপর বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে অবশেষে শেষ একটি মোক্ষম আঘাতে ফিনকি দেওয়া রক্তের মধ্যে ষাঁড়টাকে যখন খতম করে ফেলে তখন সহস্র সহস্র দর্শক আকাশ ফাটানো উল্লাসে মাটাডোরের জয়ধ্বনি করে ওঠে।

এমন একটা রোমাঞ্চকর বুলফাইট দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে আছি, এমন সময় আমার সেক্রেটারী খুঁজে খুঁজে আমার কাছে এসে প্রায় কানে কানে বললে, দুঃখিত স্যার, আপনাকে বিরক্ত করতে হল, একটা খুন হয়ে গেছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা জড়িত আছে এ ঘটনায় এখুনি একবার যেতে হবে।

গুলি মারো খুন-খারাপীতে, এসব বুলফাইট দেখতে দেখতে সাধারণত যা বলে থাকি তাই বললাম, বসো দিকি। ষাঁড়টার বধক্রিয়াটা না দেখে উঠছি না। ভুলে যাও খুনের কথা। মৃত মানুষটি আর বেঁচে উঠবে না গেলে? আশা করি এইটুকু বিলম্বে শবদেহ রেগে যাবে না।

ফলে দুজনে শিহরিত রোমাঞ্চে ভরা বুলফাইটিং শেষ পর্যন্ত দেখে গেলাম। পনের শ' পাউণ্ড ওজনের ষাঁড়টি এক সময় ভবলীলা সাঙ্গ করল। গলা ফাটানো হর্ষধ্বনির মধ্যে দর্শকদের মধ্য থেকে

াটাডোরের উদ্দেশ্যে ফুল টুপি টাকা পয়সা ইত্যাদি বৃষ্টির মত বর্ষিত হতে লাগল।

আমরা বেরিয়ে পুলিশ কার নিয়ে চলে গেলাম খুনের স্থান মক্সিকো সিটির অভিজাত অঞ্চলের রক্তবর্ণ এক অট্টালিকায়। গিয়ে দেখলাম ক্রিমিনাল আইডেন্টিফিকেসান ল্যাবরেটরীর ডিরেকটর দুইজেনো সহকারীদের নিয়ে কাজে লেগে গেছে। আর আছে উপস্থিত স্থানীয় টহলদারী পুলিশ কার্ডানো, সে-ই এই খুনের ব্যাপার প্রথম আবিষ্কার করে। মালিকপক্ষের দেওয়া এক চাবি আছে তার কাছে এই বাড়ির পেছনের দরজার।

শোনা গেল, বাড়ির এই ভদ্রমহিলা নাকি তার খবরাখবর ও নজর রাখবার জন্য কিছু দক্ষিণা দিত কার্ডানোকে। ওর মুখে জানা গেল ভদ্রমহিলা একাই থাকত এ বাড়িতে। রোজকার মত আজও পেছনের দরজা খুলেই এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। সারা বাড়ির প্রতিটি ঘরের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এমনভাবে তছনছ করা হয়েছে যে মনে হয় খুনী একজন অন্ধ উন্মাদ ব্যক্তি। এমন ভাঙচুর, ওলট-পালট, ছড়ানে-ছিটনো বড় একটা দেখা যায় না। বিছানা বালিশ তোষক, কৌচ, গদি কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, দেয়াল থেকে বিচিত্র সব বস্তু টেনে নিয়ে সমস্ত চীনে মাটির বাসন, ল্যাম্প, কাঁচের গ্লাস প্লেট ডিকান্টার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মেঝেময় ছড়িয়ে রেখেছে। ওয়ারড্রপের যাবতীয় পোষাক উপুড় করে ফেলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করা। টয়লেট দ্রব্যাদি সর্বত্র ছড়িয়ে। চেয়ার টেবিল ওলটানো, বৈঠকখানাঘরের মেঝেতে শত শত চিঠিপত্র পড়ে রয়েছে।

এইসব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে রয়েছে সুন্দরী, সুবেশা, মধ্যবয়সী কৃষ্ণকেশী এক ভদ্রমহিলার মৃতদেহ। তার মস্তকটি প্রায় চূর্ণিত।

—এই মৃতা ভদ্রমহিলার নাম হল সেনোরিতা জ্যাসিন্তা গাবনাজ, কার্ডানো জানায়।

—এর সম্বন্ধে তুমি কি কি জান বল।

কার্ডানো জানায়, ভদ্রমহিলা নাকি ছিল অতীব রহস্যজন মানুষ, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া আদৌ বাড়ির বার হত না চাকর-বাকররা খাবার তৈরী করে দিত। এর বন্ধুবান্ধব কে ছিল এ আদৌ ছিল কিনা কার্ডানো সে খবর জানে না।

আমার কেমন বিশ্বাস হল না, এমন সুন্দরী মহিলা কখনই নিরা নির্জন-জীবনযাপন করতে পারে না। এত চিঠিপত্র যার ঘরে কখনই নির্বান্ধব হতে পারে না।

মিগুয়েল অ্যালভারেজ নামক আমাদের পুলিশ ফটোগ্রাফ এসে হত্যাদৃশ্য ও ঘরের নানা অ্যাংগলে নানা ধরনের ফটো নিল।

আমি তাকে রহস্য করে বললাম, এ বাড়ির দেওয়ালে দেওয়া অসংখ্য ভাল ফটোগ্রাফ টাঙানো রয়েছে, মনে হয় তোমার একজ ভাল কম্পিটিটার রয়েছে এ নগরীতে।

মিগুয়েল হাসল, বলল আমার তোলা ছবির চেয়ে ওগুলো কোনে ক্রমেই ভালো নয়।

—বেশী গর্ব ভাল নয় হে। আমি হেসে বলি। যদিও জা মেক্সিকো নগরীর মধ্যে বোধকরি সত্যিই সেরা ফটোগ্রাফার সে।

প্রকৃতপক্ষে দেওয়ালের ঐ ফটোগুলো আমাকে যার-পর-ন বিস্মিত করে তুলল। ফটোগুলো হল এ নগরীর প্রখ্যাত সব শিল্পপ ডাক্তার, আইনজীবি প্রভৃতির। এ যেন এ নগরীর সম্মানিত নাগরিকদের ফটোগ্রাফের গ্যালারী। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছবিগুলির পেছনে সেইসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বহস্ত লিখিত বাণীসমূ কেউ লিখেছে ঃ

—আমার বাইরের জগৎ ভুলিয়ে দিয়েছে এমন মহিলা।

—জ্যাসিন্তা—মেক্সিকোর সুগন্ধী পুষ্প—সকৃতজ্ঞভাবে তোমার

—এ সংসারের সব সেরা বিস্ময়কর মেয়েকে, গভীর ভালবাসাসহ

—তোমার ভুবাহুবন্ধন স্বর্গীয় সুষমা। জীবনকে নতুন ক

ালবাসতে শেখানোর জন্য অজস্র ধন্যবাদ।

আবার কতগুলো ছবির পেছনে অন্য ধরণের বাণী ঃ

—মেক্সিকোর শ্রেষ্ঠ জোতির্বিদ মহিলাকে, নিঃসীম কৃতজ্ঞতাসহ।

—গ্রাফোলজিস্ট (হস্তাক্ষর পরীক্ষা দ্বারা চরিত্র নিরূপণ শাস্ত্র) ্যাসিন্তাকে, যার কখনো ভুল হয় না।

—সব সেরা সম্মোহন বিশারদ জ্যাসিন্তাকে।

আমি ভেবে হতবাক হয়ে গেলাম এতগুলো গণ্যমান্য নাগরিক কি রে একটিমাত্র রূপসী রমণীর প্রভাবের ক্রীতদাস হয়ে গেল। এ হিলাটি কি তবে প্রণয়ের দেবী ছিল?

এরপর আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর একটি অবিশ্বাস্য বাদ দিল। পরীক্ষান্তে সে বলল যে, যদিও সমস্ত ফটোই গ্লসিতে প্রিন্ট, তবুও এদের কোনোটার মধ্যেই কোনো আঙ্গুলের ছাপ নেই। স কি! তাজ্জব হলাম আমি। এতগুলো লোক এত সব দরদ ভরা ন্তব্য ফটোর পেছনে লিখে দিল, অথচ কারুরই হাত বা আঙ্গুলের াপ পড়ল না তাতে! এ তো অসম্ভব ব্যাপার।

—সমস্ত ফটো নিয়ে যাও ল্যাবরেটরীতে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা রে দেখবার জন্য।

আমরা যখন সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছিলাম খুনের কানো ক্লু পাবার আশায়, এমন সময় জনৈক সহকারী ১৯১৩ এর ৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রের একটি কাটা টুকরো আমার াতে দিল। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন স্তম্ভে তাতে ছাপা ছিল :

সেনোরিতা জ্যাসিন্তা অ্যাবনাজ স্পেন দেশ পরিভ্রমণের জন্য বেশ য়েক মাসের জন্য তার সুন্দর গৃহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। ফিরে এলে তার মক্কেলগণকে পূর্বাহ্ণে সে সংবাদ জ্ঞাপন করা হবে।

তবে কি ঐ ফটোসমূহের মালিকরাই মহিলার মক্কেল সমূহের অন্যতম? তাদের লিখিত বাণীগুলি কি প্রণয় কাহিনীর ব্যাপার ঙ্গিত করে? তাহলে এর সঙ্গে গ্রাফোলজি, মাইণ্ড রিডিং বা সম্মোহন

বিত্থার যোগাযোগ কোথায় ?

চিঠিপত্রগুলি আমার অফিসে নিয়ে গেলাম। স্পেনের মাদ্রি পুলিস দপ্তরে কেবলগ্রাম করে জানতে চাইলাম জ্যাসিন্তা সম্বন্ধে কো নথিপত্র তাদের দপ্তরে আছে কিনা। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য পাঠি দেওয়া হল।

না। ফটো দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করেও কোন ফিংগার প্রি পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে মাদ্রিদ পুলিশ জবাবে জানাল সেনোরিতা অ্যাবনাজ ১৯৩১-এর ৪ঠা মার্চ এসে পৌঁছান মাদ্রি এবং তিনি রাজা আলফনসোর ব্যক্তিগত অতিথি হিসেবে তাঁ রাজপ্রাসাদে বসবাস করে গেছেন। বিশদ বিবরণ পরে যাচ্ছে।

এ সংবাদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। এ তো সাধারণ কেস আদৌ নয় গণ্যমান্য নাগরিক তদুপরি রাজা রাজড়ারা এর সঙ্গে জড়িত। স্পেনী রাজার সঙ্গে এই রূপসী মহিলার পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা কি হিসেবে উপপত্নী ? নাকি জ্যোতিষিণী ? কিংবা শুধুমাত্রই বান্ধবী ? খুব সতর্কত সহকারে না এগোলে বিপদ। বিদেশী রাজা বাদ দিলেও স্বদেশে বিশিষ্ট গণ্যমান্যদের নিয়েও সাংঘাতিক সমস্যা সমুপস্থিত। এক বেপথে গেলে সম্ভ্রান্ত নিরপরাধ কিছু মানুষেব সম্মান হানিক স্কাণ্ডালের আশঙ্কা রয়েছে।

ভদ্রমহিলার বাড়িতে টাঙানো ছবির মধ্যে একজন ডাক্তার একজন সামরিক অফিসার আমার বন্ধু-স্থানীয়। এদের কোনো গোপ জীবন ছিল আমার বিশ্বাস হয় না, তবু এদের কাছ থেকে রূপবত মহিলার বিষয়ে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

মাদ্রিদ পুলিস পরের কেবলগ্রামে জানাল, জ্যাসিন্তা এর আ অর্থাৎ ১৯৩০ সালেও সেখানে গিয়ে রাজার অতিথিরূপে বাস ক এসেছেন। সে সময় রাজার বিরোধী একজন সাংবাদিকের বিরু তিনি মানহানির মামলাও করেন।

আমার সহকারী ডিটেকটিভরা কাজে লেগে গেল। ফটোর অপ

পৃষ্ঠে লিখিত লিখনগুলি দেখলে মনে হয় ভদ্রমহিলার বহু প্রণয় ঘটিত ব্যাপার বর্তমান।

এখন জ্যাসিন্তার অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন। ইউকাটান উপদ্বীপের, পাথরের পিরামিড, সানগড, ক্যালণ্ডার স্টোন ও রহস্যজনক পালকওয়ালা সর্পের জন্য প্রসিদ্ধ অঞ্চলের এক প্ল্যান্টেসান মালিকের ঘরে জন্ম এই মহিলার। বাপের মৃত্যুর পর তেইশ বছর বয়সে সে মেক্সিকোতে আসে সামাজিক জীবন উপভোগ মানসে।

এ নগরীতে কেউ জানাশোনা নেই। তখন সে ছিল ভীত সন্ত্রস্ত, লজ্জাবতী সুন্দরী এক তরুণী। কোনো ছেলের সঙ্গে মিশতো না, পিতৃধনের সৌজন্যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। সাইকোলজীর যাবতীয় বিষয় সে অধ্যয়ন করে। মেয়েটি তখন থেকেই বহুভাষাবিদ, লাইব্রেরীতে তার অজস্র পুস্তক ছিল। আবার গ্র্যাফোলজি, অ্যাস্ট্রোলজি ও হিপ্নোটিজম সম্পর্কে ফ্রয়েড, জাং, অ্যাডলার প্রভৃতির নানা গ্রন্থও ছিল সেখানে।

ডাক্তার বন্ধুকে খবর দিয়েছিলাম। সে এলো। কি ব্যাপার হে আরনেস্তো, হঠাৎ আমায় তলব কেন?

আমি জানালাম তার হস্তলিপি সহ তার ফটো দেখা গেছে মহিলাটির ঘরের দেওয়ালে। অতএব বন্ধু তোমার সঙ্গে যখন মৃতা মহিলার এত ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহলে এবারে ওর বিষয়ে যা জান সবিস্তারে বল।

বন্ধু যেন আকাশ থেকে পড়লো। বলল, ঐ ভদ্রমহিলাকে জানা তো দূরের কথা ওর নাম পর্যন্ত আমি শুনিনি।

আরে সংকোচ কেন বন্ধু। ভয় নেই, তোমার স্ত্রীকে আমি এ কথা ফাঁস করে দেব না।

নগরীর প্রখ্যাত ডাক্তার এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল। দেখ আরনেস্তো, আমাদের বন্ধুত্ব প্রায় পঁচিশ বছরের। তুমি আমার সব

মিস্ট্রেসদের সংবাদই জান। বিশ্বাস কর, একে আমি চিনি না।

যখন ফটোগ্রাফ ও লেখা দেখালাম, ডাক্তার বন্ধু তাজ্জব হয়ে গেল। হ্যাঁ, এ ফটো তার এবং লেখাটাও তারই হাতের লেখা বলে মনে হয়। এতদসত্ত্বেও বন্ধু বলল, বিলিভ মি, আমি ফটো কাউকে দিইনি বা ও লেখাও আমি লিখিনি। এটা জঘন্য জাল।

এ ত মহা মুশকিল হল দেখছি। বন্ধুকে অবিশ্বাস করতেও পারছি না, অথচ ব্যাপারটা ··

এরপর দ্বিতীয় বন্ধু সামরিক অফিসারের সঙ্গে দেখা করলাম বিখ্যাত এক রেস্টুরেন্টে। তারও একই অভিব্যক্তি। সেও শুনে তাজ্জব. দেখে বিস্মিত। এ ফটো তার, এ লেখা তার, কিন্তু সে নাকি এ ফটো কাউকে দেয় নি বা এ লেখা লেখে নি। ভদ্রমহিলাকে সে চেনে না।

আমি বিহ্বল। বাধ্য হয়ে জ্যাসিন্তার দেওয়ালের যাবতীয় ফটোগ্রাফের মালিকদের সঙ্গে শহরের নানা অভিজাত এলাকায় গিয়ে দেখা করলাম। প্রত্যেকের এক উত্তর। এ নারীকে তারা চেনে না, জানে না। ফটোও দেয় নি, লেখাও লেখে নি!

বাদ বাকি অনেকে স্বীকার করল তারা ভদ্রমহিলার কাছে সম্মোহন, জ্যোতিষী বা মাইণ্ড রিডিং সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুকাল যাতায়াত করেছে। স্রেফ মক্কেল হিসেবেই, আর কিছু নয়।

তাহলে কি এইসব মানুষদের একজনই খুনী, নাকি হত্যাকারী বাইরের কোনো দুস্কৃতকারী! এই সব ইণ্টারভিউতে দুটি জিনিষ ব্যক্ত হল: (১) কেউই মহিলাকে তাদের উক্ত ছবি দেয় নি, আর (২) সবাই একই ফটোগ্রাফের দ্বারা ফটো তুলিয়েছিল। এবং সে হল শহরের সেরা এবং আমাদের পুলিস ফটোগ্রাফার মিগুয়েল অ্যালভারেজ।

খুনের সঙ্গে জড়িত হতে চলেছে অথচ ব্যাপারটা জাল সাজানো সন্দেহ হওয়ায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই ক্ষোভ প্রকাশ করে উঠলেন। প্রেসিডেন্টের একজন দূর-আত্মীয় ত বলে শাসালেন যে এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেন স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে দিয়ে।

আমরা পুলিস বিভাগ পড়লাম মহা মুশকিলে। কোনোদিকে কোনো সূত্র নেই। তাই বুঝি সর্বাগ্রে মনে পড়ল আমাদের পুলিস ফটোগ্রাফার মিগুয়েল-এর কথা। আমি ভদ্রমহিলার বাড়ি থেকে পাওয়া যাবতীয় চিঠি ও ফটোগ্রাফারের উপর লেখা, প্রধান হস্তলিপি বিশারদের কাছে পাঠালাম। তিনি পরীক্ষা করে এক চমকপ্রদ সংবাদ দিলেন। চিঠি ও ফটোর পেছনকার লেখা একই মানুষের হস্তলিপি। সে মানুষ হল জ্যাসিন্তা স্বয়ং। হস্তলিপির ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ এই মহিলারই হাতের লেখা সব।

তবে কি জ্যাসিন্তা ব্ল্যাকমেইল করবার মানসে এই সব জাল লেখা দিয়ে ঘর সাজিয়েছিল? নাকি তার ব্যবসার খাতিরে মক্কেলদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য এটা করেছিল? কিংবা এও হতে পারে মহিলাটি অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির জীব, সে সব নকল করে নিজের মনকে বহু প্রেমিক আছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। আমি ফটোগ্রাফারকে ডেকে পাঠালাম। তার তোলা ফটো মহিলার ঘরে এল কি করে এবং যদি সে দিয়ে থাকে তো ঘুণাক্ষরেও আমাকে এতাবৎ জানায়নি কেন, আর সেই সঙ্গে ও নিশ্চয়ই বলতে পারবে সমস্ত ফটোগুলির মধ্যেই কোনো আঙুলের ছাপ পর্যন্ত নেই কেন।

মিগুয়েলকে এসব প্রশ্ন করাতে সে প্রথমটা কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। পরে জেরার মুখে পড়ে মুখ খুলল।

—স্যার, আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন! আমার সঙ্গে জ্যাসিন্তার পরিচয় হয়েছিল ফটো তোলার ব্যাপারে। আমার একটি প্রাইভেট স্টুডিও ছিল। আপনি জানেন আমি এ ব্যাপারে খুব নাম করেছিলাম। জ্যাসিন্তার ফোন পেয়ে ওর বাড়িতে গিয়ে বিরাট দক্ষিণার পরিবর্তে ওর একটা ফটো তুলে দিই। সে ফটো এত ভাল উৎরে গিয়েছিল যে জ্যাসিন্তা খুশীতে ডগমগ হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে দেহদান করে ফেলল সে রাত্রে। সেই শুরু। ক্রমে আরও ঘনিষ্ঠতা। আমি ওর

গুপ্ত-প্রণয়ী বনে গেলাম। টানা এক বছর আমি ওর ভালবাসা ও দেহ উপভোগ করেছি। আমার কিন্তু ওর দেহ ছাড়া ওর প্রতি এক বিন্দু ভালবাসাও ছিল না। ও আমায় ভালবাসত অন্য কারণে। সেটা বুঝলাম পরে।

—এই সব প্রেম প্রেম খেলার জন্য তুমি কত টাকা পেতে বা পেয়েছ?

—সঠিক হিসেব নেই। মোটামুটি দশ থেকে পনের হাজার।

—আসল কারণটা কি শুনি?

—জ্যাসিন্তা পাগল হয়ে গিয়েছিল শহরের কিছু গণ্যমান্য লোকের ফটো পাবার জন্য। সেই ফটো নাকি তার কাছে সোনার চেয়েও মূল্যবান। এই সব ফটো ঘরে টাঙিয়ে সে অপরাপর মক্কেলদের মনে তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার তালে ছিল। আমি মিগুয়েলকে এক বাণ্ডিল ছবি ও এক গুচ্ছ প্রেমপত্র দেখালাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ এই সব ছবি আমি তুলেছি। তবে প্রেমপত্র আমার লেখা নয়। জ্যাসিন্তা ওগুলো লিখেছে ওর মনের এক অদ্ভুত বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য। কল্পনায় ও প্রেমিকা সেজে আনন্দ পেত।

—মক্কেলদের নিয়ে কি করত?

—অনেকে অনেক কিছুর জন্য আসত। পছন্দ মতো কাউকে পেলে তাকে সম্মোহন করে, নিজে কাল্পনিক প্রেমিকা সেজে প্রেম-প্রণয়েব অভিনয় করে তাদের দ্বারা নিজের দেহের লালসা মিটিয়ে নিত! তবে ওর ক্ষমতা ছিল অসীম, যে কোনো লোকের হাতের লেখা দেখে তার চরিত্র হুবহু বলে দিতে পারত।

সব শুনলাম, বুঝলাম, কিন্তু একথাটা বুঝলাম না যে কেন কোনো ফটোতেই কোনো আঙুলের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। আর হত্যাকারীর হাতের ছাপও কেন অনুপস্থিত।

—স্যার, আপনি নিশ্চয়ই এবার জ্যাসিন্তার হত্যারহস্য জানতে চান?

বলে কি! নিশ্চয়ই চাই, সেই জন্যেই ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

এত চেষ্টা আর প্রচেষ্টা।

তখন মিগুয়েল বললে, যেদিন নিহত হয়, সেই রবিবার বিকেলে আমি ওর বাড়িতে এসে দেখি একজন মক্কেলের সঙ্গে ওর ঝগড়া হচ্ছে পাশের ঘরে। লোকটাকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম বেশ লম্বা চওড়া দৈত্যাকার চেহারা, ধূসর রঙের স্যুট, হাতে পোর্ট ফোলিও ব্যাগ। তারপরই আমি চলে যাই। ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাইনি।

—বেশ আজ এই পর্যন্তই, আমি বললাম, এরপর প্রয়োজন হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

মিগুয়েল তখনকার মত বিদায় নিল। ওর এ কাহিনী আদৌ আমার মনঃপুত হয়নি। ওর উপর আমার খুবই রাগ হল, কেন সে এতদিন জ্যাসিন্তার সঙ্গে ওর এই প্রকার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা আমায় বলেনি। পুলিস ফোর্সে অসৎলোকের স্থান হওয়া উচিত নয়।

ওর সঙ্গে কথাবার্তার মুখে আমি আঙুলের ছাপের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ মাত্র করি নি বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিলুম। একমাত্র যে চিঠিগুলি ওকে দেখতে দিয়েছিলাম এবং ও ধরে নাড়াচাড়া করেছিল সেগুলোকে ফিংগার প্রিণ্ট-এর জন্য পাঠিয়ে দিলাম। সে প্রিণ্ট আমাদের দপ্তর ঘুরে যে রিপোর্ট নিয়ে এল তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমাদের এই মিগুয়েল আসলে পেড্রো সেলিগোজ নামক এক অপরাধী ব্যক্তি, যে ইতিপূর্বে বলাৎকারের অভিযোগে ভেরাক্রুজে কারাদণ্ড ভোগ করে এসেছে। আমার কাছে এবার সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আর কালহরণ নয়। একদল ডিটেকটিভকে পাঠালাম ওর বাড়ি সার্চ করতে। সেখানে তারা পেল রক্ত মাখা একটা সার্ট ও ট্রাউজার এবং একটা ভারী গদার মত বস্তু!

আর পরিত্রাণ নেই। আমার অফিসে সে কিঞ্চিৎ কাঁপা গলায় স্বীকারোক্তি করল: হ্যাঁ স্যার জ্যাসিন্তাকে আমি খুন করেছি। ফটো-

গ্রাফিতে সাফল্য লাভের পর আমি আর পূর্বজীবনে ফিরে যেতে চাই নি। দণ্ড ভোগের পর থেকে আমি ভেরাক্রুজে থাকা স্ত্রী ও মেয়ে ছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় মেয়েদের ঘৃণার চোখে দেখতাম।

কিন্তু আমি অর্থের কাঙাল ছিলাম, আর জ্যাসিন্তার সে অর্থ ছিল অঢেল। যদিও ওর সীমাহীন লালসা, ঈর্ষা, কলহ, প্রেম-প্রণয়ের বাড়াবাড়ি আমার অসহ্য লাগত, তবুও যেহেতু ও আমার এক একটা ছবি আজগুবি টাকায় কিনে নিত, তাই সব কিছুই বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিতাম।

একদিন রাত্রে ও আমায় বলল, আমায় নানাধরণের কথা বলে বলে আদর কর, ভালবাসার কথা, কামনা বাসনার কথা। ও শয্যা-সঙ্গিনী থাকাকালীন আবোল তাবোল অনেক কিছু কথা বলে গেলাম সোহাগ ভরে। কিন্তু পরদিন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম দেখে যে আমার সেই সব কথা অজান্তে টেপ-রেকর্ড করে রেখেছে জাসিন্তা। উপরন্তু আমায় এই বলে ভয় দেখাল, আমি যদি ওর কথা মত ক্রীতদাসের মত না চলি তাহলে এই টেপ আমার ফ্যামিলিকে গিয়ে শুনিয়ে আসবে। শুনে আমার মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে গেল। তক্ষুনি ওকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে হল। অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই আমার কাছে ক্ষমা চাইল, আরো কিছু ছবির অর্ডার দিল। এভাবে মাস দুই কাটল।

তারপর ওর গাড়ি করে দুজনে গেলাম সিউডাড জুয়ারেজে। সেখানে সর্বপ্রথম ও আমাকে প্রস্তাব দিল স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে ওকে বিয়ে করবার। কিন্তু পরমাশ্চর্য ঘটনা, ফিরে আসবার পর ও আমায় আমার ডাইভোর্স পেপার্স এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখাল। আমি দেখে তাজ্জব, হুবহু আসলের মত, অথচ আমি জানি সেগুলা নকল।

শুধু দেখানো নয়, আমাকে ভয় দেখানোও চলল। সে ঘ্যান ঘ্যান প্যানপ্যানে অস্থির হয়ে গেলাম। বলে কি এই আধা-গণিকা নারী। আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ছেড়ে ওর মত লালসা-লোলুপ নষ্ট চরিত্রের মেয়েকে বিয়ে করা। কত বড় তঞ্চক, ও কিনা ডাইভোর্স আর ম্যারেজ

সার্টিফিকেট জাল করে আমার জীবনকে ব্ল্যাকমেল করে পঙ্গু করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে!

ফের রক্ত চড়ে গেল মাথায়, সে রক্ত আর নামল না। ওকে খুন করতে হবে এবং এক্ষুণি, তবেই আমার এই শয়তানীর হাত থেকে পরিত্রাণ। শুধু হত্যা নয় ওর যাবতীয় বস্তু-সামগ্রী আমি ভেঙে চুরে ধ্বংস করে ছাড়ব।

—তুমি কি গ্লাভস্ ব্যবহার করেছিলে মিগুয়েল?

—হ্যাঁ স্যার, ওকে হত্যা করে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করার পর আমার সম্বিৎ হল, কি সাংঘাতিক কাজই না আমি করেছি।

—তাই ফটোগুলো থেকে সযত্নে যাবতীয় আঙুলের ছাপ ধুয়ে মুছে ফেললে, তাই না?

—যথার্থই তাই স্যার, মিগুয়েল আচ্ছন্নের মতো বলে যায়, আমি মুর্খ তাই ভুলে গেলাম যে ফটোগ্রাফার হিসেবে তো আমি সনাক্ত হবই।

আমার সামনে বসে আছে একজন অনুতপ্ত, ভীত, ভেঙেপড়া যুবক। ওর কথা অবিশ্বাস করবার কথা নয়। নামকরা ফটোগ্রাফার হিসেবে যে নিজের অতীত জীবন ভুলে যশ অর্থ সহ যথেষ্ট প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছিল, সে কিনা অবশেষে সীমাহীন দেহজ লালসা-লোলুপ এক রূপসী ডাইনীর পাল্লায় পড়ে তারই কলের পুতুল বনে গিয়েছিল। এবং তার পরিণতিতেই এই সাংঘাতিক অপরাধ অনুষ্ঠান। ওর জন্য দুঃখ হয়। তবে খুনীর ক্ষমা নেই।

১৯৩২-এর ২৩শে মে বিচারে মিগুয়েল অ্যালভারেজ-এর তিরিশ বছর কারাদণ্ড হয়। পরে অবশ্য কয়েদী-ট্রেন থেকে পালাবার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। এ অপরাধ কাহিনীর একটি মাত্র ভালোর দিক আছে, সেটা হল উক্ত নিমফোম্যানিয়াক কামাচারিণী সেনোরিতা জ্যাসিন্তা অ্যাবনাজ বহু পূর্বেই তার যাবতীয় ধনসম্পত্তি ইউকাটান-এর এক অনাথ আশ্রমকে দানপত্র লিখে দিয়ে গিয়েছিল।

যে শব কোনোদিনই ছিল না

(সাওপাউলো, ব্রেজিল)

অ্যাডিয়াস সোয়ারেস ডা সিলভা ছিল সে ধরনের দুর্বৃত্ত যারা ছোট ছোট অসংখ্য ছাঁচড়া অপরাধের মাধ্যমে সদা-সর্বদা পুলিসদের জ্বালাতন করে ফিরত। বড় বড় ক্রিমিনালদের নিয়ে কিন্তু পুলিস বিভাগ এতটা উত্যক্ত হয় না।

বছর ছয় আগে ডা সিলভা আমার ডিপার্টমেণ্টকে খুবই জ্বালাতন করে ফিরছিল। আগেই বলেছি যে সে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুরি-ডাকাতি করত না। সে কানের কাছে ভন-ভন করা বিরক্তিকর মশককুলের মত অতি দরিদ্র ও সাদাসিদে সরল মানুষদের টুকিটাকি চুরি করে ফিরত।

ডা সিলভার আরেকটি মহৎ গুণও ছিল। তা হল সে ছিল নামকরা মদ্যপ। সে মদ খেত কোনো রকম আমোদ-স্ফূর্তির জন্য নয়, কেননা সে রকম পয়সার জোর তার ছিল না। সে মদ্যপান করত বুঝি কিছু একটা ভুলে থাকবার প্রয়োজনে। তবে বলে রাখি, দুরন্ত মদ্যপান করলেও আসল জ্ঞান তার সর্বদাই টনটনে থাকত। অর্থাৎ মদ্যশালার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে একটুকুও তার নজর এড়াতো না।

এক রাতের ঘটনা। পরনামবুকো প্রদেশের এস্‌কাডা শহরের ক্যান্টিনে বসে ক্রমান্বয়ে বোতলের পর বোতল সস্তা মদ গিলে যাচ্ছিল ডা সিলভা। আমাদের ব্রেজিলের মদ, তা সে যত সস্তাই হোক, জিনিষটা বেশ ভাল, ফলে নেশাটি ওর ভালই জমেছিল, তবে ওর স্বভাব বশত চতুর্দিকে নজর বোলাতে বোলাতে একস্থানে সহসা দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে গেল। ওর জুলজুলে দৃষ্টিসীমায় দেখল সে টেবিলে বসে আছে একজন প্রখ্যাত চিনিকল মালিক। নজর দেবার মতই মানুষটি, সে বোতলের পর বোতল দামী ব্র্যাণ্ডি পান করছিল আর মাঝে মাঝে একশ

ক্রুজেইরো নোট ভাঙিয়ে দাম মিটিয়ে দিচ্ছিল।

সন্দেহ নেই সস্তা মদ ব্যাকুসের নেশায় ডা সিলভা পরমানন্দে ভাসছিল। তবে মাতাল হলেও জ্ঞানের নাড়ি টনটনে থাকায় সে মনে মনে প্ল্যান করে নিল ঐ ধনী চিনিকল-মালিককে তার ক্যানটিনা গাঁয়ের ঘরে ফেরবার পথে পিছু নিতে হবে।

মধ্যরাত্রের অনেক পরে শেষ গেলাস গলায় ঢেলে চিনিকল-মালিক টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে, পাক খেতে খেতে, উল্টো-পাল্টা সুরে গান গাইতে গাইতে সে আঁকা-বাঁকা গতিতে আখের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে বাড়ির পথে অগ্রসর হতে লাগল।

এদিকে ডা সিলভা, তার নিত্য সহচর পোশাকের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত দীর্ঘকায় একটি সীসের পাইপ সহ চিনিকল-মালিকের পিছু পিছু অজ্ঞাতসারে চলতে লাগল। যখন ওরা প্রায় নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ডা সিলভা মাতাল চিনিকল-মালিকের মাথায় মারল এক প্রচণ্ড ঘা। ছিটকে লোকটা আলের ধারের নালার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জ্ঞানহীন হয়ে। খুশী মনে সে ধনী মাতালের পকেট সাফ করে ৭০০ ক্রুজেইরো (৩৭০ টাকার মত) পেয়ে গেল।

মদই খাক আর না খাক ডা সিলভা তার অভ্যেস মত দ্রুতপদে আখ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গাঁয়ে যাবার পাকা রাস্তায় পা দিয়েছে কি না দিয়েছে সহসা সে নিজ মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত অনুভব করল। এবং তন্মুহূর্তে অচৈতন্য হয়ে রাস্তায় পড়ে রইল।

তীব্র বেদনা এবং দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে চোরপ্রবর জ্ঞান ফিরে পেল। সারা গায়ে ধুলো-কাদা, সস্তা মদের খোঁয়াড়ি এবং অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে প্রচণ্ড আঘাতের ব্যথায় দেহ তার দারুণ জর্জরিত। মাথার রক্তে গায়ের জামা ভেজা। বহু কষ্টার্জিত ৭০০ ক্রুজেইরোর জন্য সে পকেটে হাত দিল। হায়, সে টাকা বাটপাড়ি হয়ে গেছে। অজ্ঞাত চোর আততায়ী ওর মাথায় আঘাত করে সে অর্থ নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। একেই বলে চোরের উপর বাটপাড়ি। শালা, কোন হারামির

বাচ্চা এ সর্বনাশ করে গেল।

সেদিন পুলিস হেডকোয়ার্টারে গিয়ে চিনিকল-মালিক এই রাহাজানির সংবাদ দিয়েছিল কিন্তু সে আততায়ীর কোনো বর্ণনা দিতে পারল না। একে অন্ধকার রাত তায় পেছন থেকে আক্রান্ত হয়েছে। সজ্ঞানে থাকলে তবু কথা ছিল, কিন্তু সে যে তখন পুরোপুরি বেহদ্দ মাতাল অবস্থায় ছিল, সে কথা খোলাখুলি পুলিসকেই বা বলে কি করে। ডা সিলভা তার পরিচিত বা জানা ব্যক্তি নয়। স্বাভাবিকভাবেই তার সংবাদ ভাসা ভাসা আন্দাজের কাহিনী।

এদিকে ডা সিলভা সঙ্গত কারণেই তার চুরি, পরে নিজের মা: খাওয়া ও টাকা খোওয়া যাবার সংবাদ বেমালুম চেপে গেল।

থানার ব্ল্যাক লিস্টে নাম থাকা সত্ত্বেও আমি সিলভাকে খোঁজ করে জিজ্ঞাসাবাদ করি নি এই জন্যে যে এ রাহাজানিটা ঠিক ছিঁচকে চোর সাদৃশ নয়। অনেকটা দুঃসাহসী, অনেকটা বেপরোয়া প্রায় মানুষ মেরে ছিনতাই। ডা সিলভা চোর বটে, তবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে অহিংস ধরনের চোর সে। তাই আমি এই আধা-খুনে চোরকে ডা সিলভা বলে সন্দেহ করে উঠতে পারি নি। অবশ্য ডা সিলভা এই ধরনের রাহাজানি তার জীবনে এই প্রথমই করল। সস্তা মদে যে কত কিছু অভাবনীয় কাজ করাতে পারে সেকথা আমার মনে আসে নি।

অজ্ঞাত চোর বা ছিনতাইবাজের কোন হদিশ করা গেল না এবং কালক্রমে কয়েক বছর কেটে গেল। কারুরই আর সে ঘটনার কথ মনে রইল না।

কিন্তু ১৯৫৪-র এক সকালে সে আমার অফিসে এল। স্ব-ইচ্ছায় নয় অবশ্য। তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে এল আমার অধীনস্থ পুলিসরা।

কত বড় হতভাগ্য। ডা সিলভা তালা দিয়ে বাইরে যাওয় অভিজাত এক ফ্যামিলির ফ্ল্যাটে ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে বেশ মোট মাল অর্থাৎ প্রায় পনের হাজার ক্রুজেইরোর মত মূল্যের জুয়েলারি হাতিয়ে জানালা গলে পালাতে গিয়ে পড়বি তো পড় একজন রাত্রিে

পেট্রলরত পুলিসের ঘাড়ে।

দাগী আসামী। বহুবার জেল খেটেছে। অতএব এ মামলায় ওকে ভালভাবেই ঝুলিয়ে দেওয়া গেল। ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

এইখানেই ওর সেলমেট ছিল কুখ্যাত খুনে জোজ সিমাও। সে পনের বছরের কারাদণ্ড নিয়ে জেল খাটছিল।

আমরা নিশ্চিন্ত হলাম বিরক্তিকর ছিঁচকেটার হাত থেকে অন্তত বছর ছয় নিশ্চিন্দি।

বহু পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে ডা সিলভা এবং জোজ সিমাও একই শহরের বাসিন্দা, ওদের দু পরিবারের মধ্যেও জানাশোনা ছিল। একই যাজকের অধীনে ছিল, একই মদ্যশালায় আড্ডা, একই স্ত্রীলোকের কাছে যাতায়াত। অচিরেই তাদের মধ্যে পুনরায় গভীর সখ্যতা স্থাপিত হয়ে গেল। এক বছরের মধ্যেই তারা হয়ে উঠল যেন সহোদর দুই ভাই। এবং উভয়ে শপথ নিল যাবজ্জীবন তাদের এ বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

নির্জন সেল-এ বসে পরস্পর পরস্পরকে তাদের জীবনের কুকর্মের এক একটি দৃষ্টান্তের কাহিনী বলে যেতে লাগল। প্রথম শুরু করল উভয়ের পরিবারের নানা গল্প দিয়ে, তাদের কৈশরের, যৌবনের খোশগল্প, প্রেম-পীরিতের কেচ্ছা, শেষে এল তাদের দুর্বৃত্তপনার ইতিহাস।

শত্রুর মুখে ঝাঁটা মেরে এ ইতিহাস তাদের সুদীর্ঘ। শত শত রাত্রির নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তুলতে লাগল পরস্পরের এক একটি কুকর্মের কাহিনী। সময় স্রোতের মত কাটতে থাকল। সহস্র রজনীর ক্রাইম।

এই ভাবে গল্প এগোতে এগোতে ১৯৫৫-তে এসে অপ্রত্যাশিত এক ধাক্কা খেল উভয়েই। সাংঘাতিক চমকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল দুজনে।

সেই এসকাডার কাহিনী এসে গেল। যে রাতে ডা সিলভা আখের

ক্ষেতে সেই চিনিকলের মালিককে মাথায় মেরে ৭০০ ক্রুজেইরো অপহরণ ও পরে নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা বাটপাড়ি হওয়ার কাহিনী বলতে, প্রথমটা জোজ খুব মনোযোগচিত্তে তা শুনে গেল।

অতঃপর সে রাতের ঘটনা সম্বন্ধে পর পর বহু প্রশ্ন করে গেল। অবশেষে দুহাত জোর করে সাশ্রুনয়নে ডা সিলভাকে আলিঙ্গন করে জোজ প্রায় ডুকরে উঠল।

—হায় হায়। আরে সাঙ্গাৎ কী সর্বনাশ ইয়ার, তুমি আমায় ক্ষমা করো পার্টনার।

—কী পাগলার মত বাৎ ঝাড়ছিস ইয়ার। ক্ষমা? ক্ষমা কিসের জন্যে বে?

—আমি—আমি শালা হারামী লোক আছি, কুত্তা আছি, কাঁদতে কাঁদতে জোজ বলতে থাকে, আমি ইয়ার তোর বন্ধুত্বের যোগ্য নই ইয়ার।

—এসব কি আজে বাজে বাত্তেলা ঝাড়ছিস ইয়ার। শুধু শুধু কাঁদছিস কেন? তুই আমার বন্ধু হবার একশোবার যুগ্যি।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জোজ তেমনি অশ্রুসিক্ত ও রুদ্ধকণ্ঠে বলে চলে, না না ব্রাদার। উঃ আমি শালা মহাপাতক, আমি চামার···

অবশেষে সবিস্তারে বেদনার্দ্র স্বীকারোক্তি করে যায় জোজ। সেদিন রাত্রে অন্ধকারে আখ ক্ষেতের বাইরে পাকা সড়কে সে-ই ওর মাথায় ডাণ্ডা মেরে সব কিছু নিয়ে পালায়। অন্ধকারে ওকে সে ডা সিলভা বলে চিনতে পারে নি।

শুনে প্রথমটা ডা সিলভা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায়। বলে কিরে শালা! এ যে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না একথা। রাগও হয় খুব। পরক্ষণেই ফের সুর নরম হয়ে আসে।

কোমল কণ্ঠে বলে ওঠে, আরে ইয়ার আমি একটুও গোসা করিনি। অন্য কোন শালা নেবার থেকে তুমি যে টাকাটা নিয়েছিলে একথা

শুনে আমি খুশি হয়েছি দোস্ত।

এরপর সহসা জোজ দারুন গম্ভীর হয়ে গেল। সহসা বুঝি মনে পড়ে গেছে নতুন একটা কথা। আর্তকণ্ঠে এবার সে বলে ওঠে, তুমি জানো ইয়ার ওরা আমায় পনের বছরের জেল কেন দিয়েছে?

—কেন দোস্ত?

—যেহেতু সেদিন রাত্রে নাকি আমি তোমায় খুন করে ফেলেছিলাম পাকা সড়কে।

—সে কি ইয়ার, এবার ডা সিলভা আর্তনাদ করে ওঠে অবাক বিস্ময়ে, বল কি সর্বনেশে কথা?

—হ্যাঁ ইয়ার সাচ বাত। অথচ আজ দেখছি তুমি সশরীরেই বেঁচে আছ দোস্ত।

এর পর জোজ সবিস্তারে বলে যায় কাহিনী। সে রাতে ওর টাকা নিয়ে আখের ক্ষেত দিয়ে পালাচ্ছিল সে। এমন সময় সেই পথে চিনিকলের কিছু শ্রমিক ফিরছিল। তারা প্রথমে তাদের মালিককে আহত অবস্থায় পায়, পরে জোজকে পালাতে দেখে ওকে জাপটে ধরে ফেলে।

পরে ওকে নিয়ে যাবার পথে ডা সিলভার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে থাকতে দেখে পাকা সড়কের ওপর। তারা ওকে দেখে খুন করা লাশ ভেবে নিয়ে, ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে ওর বিরুদ্ধে ডাকাতি ও খুনের অভিযোগ করে।

পুলিস যখন পরদিন অকুস্থলে আসে, তখন সেখানে রক্তের দাগ পেলেও মৃতদেহ পায় না। পাশ দিয়েই ইরিগেশন খাল বয়ে যাচ্ছে, পুলিস ভেবেছে যেভাবেই হোক লাশ জলে পড়ে গিয়ে ভেসে চলে গিয়েছে।

জোজ নিজেও ভেবেছিল যে ডা সিলভা মরে গিয়েছে। তাই খুনের অপরাধে তার পাকা পনের বছর জেল হয়ে যায়।

হায় হায় কি মারাত্মক ভুল।

আজ কিনা দেখছে ডা সিলভা জীবিত এবং সশরীরে তার সামনে উপস্থিত।

আনন্দের আতিশয্যে দুজন দুজনকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল। ছোট্ট সেল-কক্ষের মধ্যে হাসি কান্না আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল যেন।

এর পরের ঘটনা খুবই দ্রুত সংঘটিত হল।

গার্ডকে ডেকে জেলারকে সংবাদ দেওয়া হল। হৈ হৈ পড়ে গেল কর্তৃপক্ষ মহলে।

পুনরায় কেস সাজিয়ে আদালতে তোলা হল।

ফলে জোজ সিমাও বেকসুর খালাস পেয়ে গেল অচিরাৎ।

জেল থেকে বাইরে বের হবার মুখে জোজ ডা সিলভাকে জড়িয়ে ধরে সজল চোখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করল, ইয়ার ডরো মৎ। আমি বাইরে গিয়ে সদ্ভাবে জীবন যাপন করে টাকা পয়সা জমাবো। তারপর তোমার সেই টাকা কড়ায় গণ্ডায় আমি শোধ করে দেব। তুমি জেল থেকে বেরিয়ে এলে তোমাকে দামী পোশাক দেব, দামী খাবার দাবার দেব, দামী মদ খাওয়াব, ভাল মেয়েমানুষ চাও তো তারও ব্যবস্থা করে রাখব। আজ চলি দোস্ত।

সত্যি সত্যি জোজ তার কথা রেখেছিল। ছ বছর বাদে ডা সিলভা বেরিয়ে এলে সে নিজ রোজগারের অর্থে জামাই আদরে রেখেছিল তাকে।

এ এক অদ্ভুত ঘটনা। 'খুনী' কিনা ছয় বছর বাদে 'নিহত' ব্যক্তিকে জামাইয়ের আদরে রেখে তার বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করে।

একেই বলে বুঝি নিয়তির পরিহাস।

ডাকাতি

(বোম্বে, ভারত)

বোম্বের প্রাক্তন অ্যাসিস্টেণ্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ পেডনেকার বললেন ঃ

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বেলা পৌনে এগারটা। একটি ক্রিম ও কালো রঙের ট্যাক্সি এসে সহসা ব্রেক কষলো বোম্বে শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ব্যাসটিয়ান রোডে, লয়েডস ব্যাঙ্কের পেছনের দরজায়। তিনজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও একজন খাকী ইউনিফর্মের লোক সেই ট্যাক্সিতে উঠতে উদ্যত হতেই সহসা ভয়ংকর ঘটনাটি সংঘটিত হল।

ভারী একটা চামড়ার ব্যাগ কোমরে শেকলের সঙ্গে বেঁধে রাম মাত্রা নামক এক ব্যক্তি বারো লক্ষ টাকা নিয়ে গাড়িতে উঠছিল, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গুলি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পাঁচজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক এগিয়ে এলো। এসে ট্যাক্সির চালককে পয়েণ্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি করে মেরে ফেলে তার দেহটাকে ঠেলে রাস্তায় ফেলে দিল। টাকার থলিসহ মাত্রাকে আক্রমণ করতে সে বাধা দিল, তৎক্ষণাৎ একটি গুলি বিদ্ধ হল তার পাকস্থলীতে। পরে ব্যাগ ছিঁড়ে নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে ফেলা হল।

ব্যাঙ্কের অপর দুজন কর্মচারীও গুলিবিদ্ধ হল। কয়েকটি রক্তস্নাত মুহূর্ত, ডাকাতের কবলে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং ট্যাক্সি। পরের মুহূর্তে উল্কাবেগে তারা ট্যাক্সিটা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। এই ভাবে ভারতের সর্বাধিক জঘন্য এক ব্যাঙ্ক ডাকাতি সংঘটিত হয়ে গেল।

এর ঠিক তিন সপ্তাহ বাদে দিল্লীর অদূরে ওঘাধ নামক এক গ্রামে সেদিন একটি বিয়ে হচ্ছিল। বর-কনে একজন পুরোহিতের

মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করছিল।

কন্যার পিতা খুবই খুশী। হরনারায়ণ নামক এই ছেলেটিকে তার কন্যার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। ভালো জামাই জুটিয়েছেন তিনি। ছেলেটি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। দিল্লী থেকে বিরাট একটি ঝকঝকে নতুন প্লীমাউথ গাড়ি চালিয়ে প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে এ গাঁয়ে বিয়ে করতে এসেছে। এইমাত্র এসে পৌচেছে ওর বিশিষ্ট কজন বন্ধু। নির্নিমেষ নয়নে তারা শুভ বিবাহ কার্য বসে বসে দেখছে।

পুরোহিত বরের ধুতির একাংশ কনের শাড়ীর আঁচলে মিলনের চিহ্ন স্বরূপ বেঁধে দিল। সোনার কাজ করা বহুমূল্য বেনারসী শাড়িতে ঘোমটা টেনে ব্রীড়াবনতা কনে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। হরনারায়ণ মাথার ফুলগুলি ঝাড়তে ঝাড়তে লুকিয়ে একবার জীবন সঙ্গিনীর মুখ চোরাচাহনীতে দেখে নিল। তার পর বিবাহ বাসরে নবাগত বসে থাকা কজনের প্রতি তার সর্বপ্রথম নজর পড়লো। দেখে তার হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। এদের তো সে চেনে না। চেহারাপত্র দেখে এ গাঁয়ের মানুষ বলেও মনে হচ্ছে না।

কিঞ্চিৎ বিহ্বল ও কম্পিত দেহ নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বিয়ের শেষ পর্যায়ের তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করলো কোনো মতে কিঞ্চিত স্খলিত পদক্ষেপে। অনুষ্ঠান শেষ। তক্ষুনি অপরিচিত সেই নবাগতের একজন দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে বরের কাঁধে হাত রেখে শান্ত ও নিম্নকণ্ঠে বলে উঠলো, নানক চাঁদের ব্যাটা হরনারায়ণ, তুমি এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার হলে।

অভিযোগ হল, ডাকাতি ও নরহত্যা। কোথায় বোম্বের রক্তাক্ত রাস্তা, আর কোথায় হাজার মাইল দূরের এক গণ্ড গ্রাম।

প্রকাশ্য দিবালোকে বোম্বেতে যে ডাকাতি হলো, তা যেন পুরোপুরি একটি সিনেমার দৃশ্য বিশেষ। পূর্বোক্ত নিখুঁতভাবে

পরিকল্পিত, প্রায় নিখুঁতভাবে সংঘটিত এই ডাকাতিতে আততায়ীরা একটি নরহত্যা এবং তিনজনকে সাংঘাতিক জখম করে আজগুবি অঙ্কের টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

বোম্বেতে প্রাক্তন অ্যাসিসটেন্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ পেডনেকার বলছিলেন, আমি তখন চাকরীতে। এ কেসটার তদন্তের ভার আমার ওপর পড়লো। কয়েক মুহূর্তের ঘটনা। সনাক্তকরণের সুযোগ ছিল না। ডাকাতরা ঝট করে আঘাত হানলো এবং চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হল তারা কোনো 'ক্লু' রেখে যায় নি। ঘটনা ঘটনাকালীন ব্যাঙ্কের এক টেলিফোন অপারেটার পুলিসে জানায়, সঙ্গে সঙ্গে শহর থেকে বের হবার প্রতিটি রাস্তা ব্লক করে চেক করা শুরু হয়ে যায়, কিন্তু তাতে ফল কিছু হয় নি। অবশেষে মেরিন ড্রাইভ এলাকার একটি সিনেমা হাউসের পেছনে উক্ত ট্যাক্সিটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ গাড়ি থেকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ভাঙা বেল্ট ও চেন উদ্ধার করে। ট্যাকসিটিতে আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু পুলিশ রেকর্ডে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। সন্দিগ্ধ এই ধরনের বেশ কয়টি মানুষকে তুলে এনে পুলিস জোর করে চললো। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই ভাল অ্যালিবাই রয়েছে, বাধ্য হয়ে মুক্তি দিতে হলো তাদের। পুলিশের চর—দুর্বৃত্তের কাজে লাগানো হল। প্রকৃত আসামীর খোঁজ ও তাদের গ্রেপ্তার করবার ব্যাপারে যে বা যারা সাহায্য করবে তাদের বা তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করা হল। সংবাদপত্রে বিশদ সংবাদ প্রকাশিত হতে প্রচুর চিঠি আসতে লাগলো পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। সবই অকাজের সংবাদ।

ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী ফার্মদের বলে দেওয়া হল হারানো টাকাগুলির নম্বর সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে। সবটাই ছিল ১০০ টাকার নোটে। কুয়াইত ও ইরান থেকে প্রাচ্যের ব্যাঙ্কেরা এটা পাঠিয়েছিল বোম্বাই ব্যাঙ্কে। এখানে এসে সই সাবুদ স্ট্যাম্প ইত্যাদি হয়ে লয়েডস্ ব্যাঙ্কের

কর্মচারীরা ওটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাবার উদ্যোগ করেছিল। সুতরাং প্রতি বাণ্ডিল নোটে এখানকার ও ইরানের ব্যাঙ্কের রাবার ষ্ট্যাম্প ছিল।

এতদিনে এত সতর্কতা সত্ত্বেও অপহৃত একটি নোটেরও বাজার হদিস করা গেল না। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ডাকাতদের নাকি কোনো মুখোশ ছিল না। তারা সাধারণ সিভিল প্যাণ্ট সার্ট পরেই এসেছিল। সবাই যুবক, একজন শুধু বয়স্ক, তার মাথায় একটা ফেলট হ্যাট ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের পুলিশের কাছে থাকা দুর্বৃত্তশ্রেণীর হাজার হাজার ফটোগ্রাফ দেখানো হল। কোনো ফল হল না। তবে একটা ব্যাপারে এইসব সাক্ষীরা একমত যে ডাকাতরা সম্ভবত উত্তর ভারতের মানুষ। হাল্কা গায়ের রঙ এবং নাক মুখ চোখ দেখে তাদের বলা সামান্য দু'একটা কথা শুনে মনে হয়েছে তারা ঐ অঞ্চলের লোক।

বোম্বের শত শত হোটেল-এ চেক আপ শুরু হল। প্রথম সূত্রপাত হল এক সময় অ্যাষ্টোরিয়া নামক হোটেলের রেজিষ্টারে দেখা গেল এপ্রিল মাসে দিল্লী থেকে তিনজন ভিজিটার এসে উঠেছিল সেখানে। তাদের নাম অনোখীলাল, শর্মা এবং হরনারায়ণ। জেরার উত্তরে হোটেল কর্মী জানায়, মনে হয় এরা খুবই শিক্ষিত এবং বিত্তশালী ঘরের ছেলে, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারেই বোম্বে এসেছিল।

দিল্লীর পুলিশকে সংবাদ দিয়ে জানা গেল এই যুবকরা কি ধরণের তথা কথিত "ব্যবসা বাণিজ্যে" লিপ্ত। তিন বছর আগে নাকি একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা চুরীর অপরাধে এরা অভিযুক্ত হয়। সেটাও ঘোড়ার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে যাওয়া লয়েডস ব্যাঙ্কের টাকা। কিন্তু প্রমাণাভাবে সে যাত্রায় তারা মুক্তি পায়। দিল্লীর ও বোম্বের ঘটনার ধারা প্রভৃতি কায়দা কানুন বিচার করে দেখা গেল এরাই আসল আসামী। একজনকে পেলে সহচর অপর দুজনের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হবে না।

ঘটনার তদন্ত স্থানান্তরিত হয় দিল্লীতে। গোপনে খোঁজ নিয়ে

জানা গেল আনোখীলাল সম্প্রতি নাকি একটি সিনেমা খোলবার প্রচেষ্টায় আছে। বোঝা গেল ভালো অর্থই তার হাতে এসেছে। ইতিমধ্যে নতুন একটি প্লীমাউথ গাড়ি সে কিনেছে! হরনারায়ণ বর্ত্তমানে একটি ক্যাণ্ডি-শপ-এর মালিক। দুহাতে পয়সা খরচা করে চলেছে। এবং শীঘ্রই বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। সেও একটি নতুন গাড়ি কিনেছে। শর্মা একটি ফিলম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স ফার্মের বড় অংশীদার হয়েছে।

এখুনি ওদের গ্রেপ্তার করা যেত কিন্তু অ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার বললেন, আগে অপহৃত অর্থ, ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। তাই এদের তিনজনের গতিবিধির ওপর সংগোপনে নজর রাখা হতে লাগলো অহোরাত্র। ওদের সাক্ষাৎ সহচরদের ওপরও নজর রাখা হল।

মে মাসের আট তারিখে আনোখীলাল ও হরনারায়ণ আলাদাভাবে নিজ নিজ গাড়ীতে দিল্লী ছেড়ে গেল। আর দেরী করা উচিত নয়। অর্ডার বেরিয়ে গেল। পুলিশ গিয়ে যমুনা নদীর ওপর ব্রীজে আনোখীলালের গাড়ী ধরে ফেললো। দেখা গেল তার গাড়ীতে নেহাৎ নিরপরাধ হরনারায়ণের কিছু আত্মীয়-স্বজনও ছিল, যারা উক্ত বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন। গাড়ীতে কিন্তু আনোখীলাল ছিল না। মনে হয় সে আঁচ পেয়েছিল যে ফাঁদের দড়ি এগিয়ে আসছে তাই সে মাঝপথে গাড়ি থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি করে দিল্লীর বাইরে রওনা দেয়। কিন্তু পুলিশও সদাসতর্ক, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে চড়াও হয়ে ট্যাক্সিটিকে ধরে ফেলে আনোখীলালকে পাকড়াও করে।

আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেই জানা যায় হরনারায়ণ দিল্লী থেকে সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী ওঘাদ গাঁয়ে বিয়ে করতে গেছে। পুলিশদলও বিনা নিমন্ত্রণেই বিয়েবাড়ির উদ্দেশ্যে অবিলম্বে যাত্রা করে।

সেখানে যা ঘটেছে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। অবশ্য বিয়ে শেষ হতে দেওয়া হয়েছে। সে রাত্রিও তার ছুটি ছিল। পুলিশদল নেমন্তন্ন

খেয়ে সারারাত্রি বরকনের ঘর পাহারা দিয়েছে পাছে 'জামাইবাবু' হাওয়া হয়ে যান। যে বিয়ের জন্য ডাকাতি করা অর্থাৎ হাতে কাঁচা পয়সা আনা, সেই বিয়ের আনন্দমাত্র বারোটি ঘণ্টা।

দিল্লী থেকে আনোখীলাল ও হরনারায়ণকে বোম্বেতে স্থানান্তরিত করা হয়। আধা সনাক্তকরণও হয়। জেরায় জেরায় ভেঙ্গে পড়ে আসামীরা। বোম্বে থেকে আটশো মাইল দূরে মাধ্য নামক স্থানে আনোখীলালের স্ত্রীর বাক্স থেকে তিনটি রিভলবার উদ্ধার করা হয়! সেখানেই অপর একটি টিনের বাক্সে ৬,৪৭,৪০০ লুক্কায়িত টাকা পাওয়া যায়। দিল্লীতেও পাওয়া যায় আরও ৪০০০ টাকা।

অপরাপর সঙ্গীদের পাওয়া যায় নি তখনো। রবিদাস নামক একজন ভারতীয় ক্রিশ্চানকে পুলিশ খুঁজছে, সে একজন ভাল ড্রাইভার এবং এই বন্দীদের সখা ছিল। মিরাটে পাওয়া গেল না তাকে। যাওয়া হল ডেরাডুন, সেখান থেকে মুসৌরী পাহাড়ে। টুরিষ্টের ছদ্মবেশে ডিটেকটিভরা গিয়েছিল। এক বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে তারা। চেহারার বর্ণনা শুনে পাহাড়ী গাইডের মনে পড়ে এমন একটি মানুষ হিমালয়ান ক্লাবে উঠেছে।

ডিটেকটিভরা যখন ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হয় রবিদাস তখন তার ঘরে ছিল না। তারা ওর বাক্স সার্চ করে ব্যাঙ্কের সেই ছাপ মারা ৯০০০ টাকা পায়। বাইরে থেকে ফিরে এসেই রবিদাস ফাঁদে পড়ে গ্রেপ্তার হয়। মীরাটে এনে জানা যায় সে সম্প্রতি ডাকাতির অর্থে কিছু ভূসম্পত্তিও ক্রয় করেছে।

পাঁচজন আসামীর তিনজনকে ধরা হল। শর্মা বন্ধুদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ধরা পড়লো প্রায় আটমাস বাদে বেরিলি রেলস্টেশনে। তিন আর এক-এ চারজন হল। বাকি লোকটির নাম বাঁকেলাল। পুলিশ ঘুরছে সংবাদ পেয়ে সে দক্ষিণ দিকে মধ্যপ্রদেশের ব্যাঘ্র সংকুল জঙ্গলের দিকে গা ঢাকা দেয়। সেখানে প্রখ্যাত দস্যুদের কারুর না কারুর আস্তানায় সে হয়ত আশ্রয়

পেয়ে গেছে। তাকে আর ধরা সম্ভব হয় নি। হয়ত সে এখন রবিনহুড সম মানসিংহের দলে একজন সহকারী ডাকাত বনে গেছে। মানসিংহ অবশ্য পরে এক গুলি যুদ্ধে নিহত হয়। বাঁকেলালের অংশের টাকা পাওয়া যায় নি। উদ্ধার হয়েছে ৭,৪৪,০০০ নগদ টাকা, কতগুলো গাড়ি, রেডিও জুয়েলারী, ষ্টক ও শেয়ার এবং সম্পত্তির দলিল।

পাপের বেতন শাস্তি এড়াতে পারলো না কেউ এক বাঁকেলাল ছাড়া। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মামলা উঠলো কোর্টে। চললো ৪২ দিন ধরে। আনোখীলাল, হরনারাণ এবং শর্মা ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হল।

বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল তাদের।

উত্তপ্ত মৃত্যু
(ডামাস্কাস, সিরিয়া)

ডামাস্কাসের ডিটেকটিভ প্রধান ইব্রাহিম গাজী বললেন ঃ

আমাদের এই নগরী দ্বিপ্রহরের তীব্র দাহে যেন মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। জ্বলন্ত সূর্যের প্রখর তাপে চামচে আকারের এ শহরের যাবতীয় মিনার, মৌমাছি-চাক গম্বুজ সমূহ, নতুন ও পুরাতন যাবতীয় অট্টালিকা যেন ঝলসে যেতে থাকে। জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে যায় অসহনীয় উত্তাপে। রাস্তাঘাট জনবিরল হয়ে পড়ে, শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক ফেজ টুপী পরা বেদুইন তাদের গাধায় চড়ে পুরনো শহরের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এমন কি বাজার অঞ্চলের শোরগোলও যেন ঘুমিয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না অসহনীয় সূর্যতাপ পশ্চিম দিগন্তে ক্লান্ত হয়ে একসময় নিস্তেজ হয়ে যায়।

এই রকম অকল্পনীয় দাবদাহ বুঝি দু'ধরনের ক্রিমিনালদের কুকর্মের সুযোগ নিয়ে আসে। এক হল মানুষ দুষ্কৃতকারী যারা এই সময় ডাকাতি, নরহত্যা বা অন্যকিছু দুষ্কর্ম করবার ফিকিরে থাকে, দ্বিতীয়টি হল অমানবিক শত্রু, স্বয়ং আগুন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অগ্নিকাণ্ড এ শহরকে জ্বালিয়ে আসছে, দু'দুবার তো সারা ডামাস্কাস সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের পুলিস বাহিনী অবশ্য এই দু'ধরনের দুষ্কৃতকারীর প্রতিই সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে।

সেবার জুলাই মাসে প্রথম সংবাদ এল শহরের অভিজাত অঞ্চল সউক সরোজার এক বাড়িতে প্রবলভাবে আগুন লেগেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা মত বলে উঠলাম, 'ডামাস্কাসের উত্তাপ-অভিশাপের অপর এক নিদর্শন।

আমিই ফোন ধরেছিলাম। ঐ অঞ্চলের প্রহরারত পুলিসম্যানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এল—চীফ, এটা অগ্নিকাণ্ডের চেয়েও ভয়াবহ কিছু। গেট দিয়ে দেখতে পাচ্ছি উঠোনে একটি মেয়ের দেহ পড়ে রয়েছে। প্রবল ধোঁয়ায় আর কিছু নজরে আসছে না।

ঠিকানা শুনে মনে পড়ে গেল ও বাড়িটা আমি চিনি। প্রাচীন আরবীয় ধরনের অট্টালিকা ওটি। সুউচ্চ দেওয়াল ঘেরা ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণও আমার নজরে পড়েছে। একজন ধনী ব্রকেড ব্যবসায়ী এটা তৈরী করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী আমাদের এই নগরী যার জন্য প্রসিদ্ধ সেই স্বর্ণ ও সিল্ক নির্মিত বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন ভদ্রলোক। হায় হায় এমন একটি ঐতিহাসিক বিরল অট্টালিকায় কিনা আগুন লাগল।

আমরা যখন অকুস্থলে পৌঁছলাম তখন করবার আর কিছু ছিল না। আগুনকে আয়ত্বে আনবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে চলেছে দমকলবাহিনী। বিরাট জনতার ভীড় গেটের সম্মুখে। তাদের কেউ কেউ বলছে ভেতর থেকে চিৎকার ও আর্তনাদের ধ্বনি তারা শুনেছে কিন্তু প্রবল ধোঁয়াচ্ছন্নতার জন্য কিছুই করা সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে।

আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম রূপবতী তন্বী অনুমান আঠারো-উনিশ বছরের একটি যুবতীর দেহ পড়ে রয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হলেও তার মুখাকৃতি ও চেয়ে থাকা বিশাল চোখ দেখে বোঝা যায় মেয়েটি নাম-করা সুন্দরী ছিল, গায়ে এ দেশীয় প্রসিদ্ধ সিল্কের পোষাক, হাতে ও গলায় সর্বাধুনিক ডিজাইনের স্বর্ণ ও জুয়েলারীর অলঙ্কার। কিন্তু তার গলায় বীভৎস এক রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন, বোধকরি এতেই সে মারা গেছে।

আমি নিচু হয়ে নিহত মেয়েটিকে দেখছি এমন সময় কানে এল ধোঁয়াচ্ছন্ন রান্নাঘর থেকে এক চীৎকারের আওয়াজ। আমি ত্রস্তে এগিয়ে যেতে দেখলাম তুজন ফায়ারম্যান অপর এক মহিলার মৃতদেহের

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আংশিক দগ্ধ দেহ দেখে বোঝা গেল অপর মৃতদেহী মেয়েটির চেয়ে এ বয়স্কা এবং সুন্দরীও বটে। তার শ্বেতশুভ্র চুলের ফাঁকেও একটি রক্তাক্ত ঘা, কোন কিছু প্রচণ্ড ভারী বস্তু পড়লে যেমন হয় তেমনি।

একটি অগ্নিকাণ্ড দেখতে এসে দু'ছুটি নৃশংস নরহত্যার তদন্তে ফেঁসে গেলাম।

উপস্থিত জনতাদের কাছ থেকে শোনা গেল এ বাড়ির বর্তমান বাসিন্দা ছিল পুলিস দপ্তরের ডাকাতি বিভাগের প্রধান কেরানী, এবং তার স্ত্রী ও কন্যা। পুলিস বিভাগের লোকের সংবাদ শুনে সর্বপ্রথমেই আমার মনে এল, তবে কি কোনো খুনী অপরাধীর প্রতিশোধ চরিতার্থের দৃষ্টান্ত এ ঘটনা। কোনো বিকৃতমানস অপরাধী বদলা নিল পুলিস বিভাগের জনৈক ব্যক্তির বংশ লোপাট করে?

পুলিস বিভাগের কমিশনার, করোনার, জুডিসিয়াল অ্যাড-মিনিস্ট্রেটর, মার্ডার স্কোয়াডের সদস্যবৃন্দ সবাই এসে হাজির হল অকুস্থলে। সবাই মিলে আমরা তখন সেই দগ্ধ উত্তপ্ত বাড়ির অভ্যন্তরে তল্লাসীকার্যে নিযুক্ত হলাম।

বোঝা গেল খুনী তার অপকর্মকে নিশ্চিহ্ন করবার মানসে সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। এদিকে আগুন যা পারেনি, দমকলবাহিনীর জলে ও কেমিক্যালে সে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রায় ধুয়ে মুছে গেছে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আধঘণ্টা তল্লাসীর পর রান্নাঘরে একটা 'ক্লু' পাওয়া গেল। সেটা হল একটা কাঠের হাতুড়ি। আমরা আরবরা ঐ ধরনের হাতুড়ি মাংসের কাবাব বানাবার জন্য ব্যবহার করে থাকি ওজন প্রায় সাত পাউণ্ডের মত। যেভাবে ওটা পড়ে ছিল, তাতে বোঝা যায় হত্যাকারী বয়স্কা মহিলাকে ওটাব দ্বারা মাথায় মোক্ষম আঘাতের পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। পোড়া সেই হাতুড়িটাকে হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ জীবনে আমি আর কখনো

লোভনীয় কাবাব খেতে পারব কিনা। আমার স্ত্রী আবার এই কাবাব প্রস্তুতে খুবই নিপুণা। দেখা গেল এ হাতুড়ি মানুষ মারতেও কতটা কার্যকরী।

তল্লাসী চলতে লাগল। হাতুড়িটা যেখানে পড়ে ছিল সেখানে আয়নাভাঙা একটা তীক্ষ্ণমুখ টুকরোও পাওয়া গেল। এটা আগুনের উত্তাপে ভেঙে নিয়ে ছুরিকা হিসাবে ব্যবহার করে অষ্টাদশী মেয়েটির কণ্ঠনালী ছিন্ন করেছে তাও অসম্ভব নয়।

করোনার তার রিপোর্টে জানালো : বয়স্কা মহিলাটি মাথায় প্রচণ্ড আঘাতেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তবে মনে হয় তাকে রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসে ফেলা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের পর। আর অষ্টাদশীর কণ্ঠনালী কাটবার পূর্বে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয় এবং দেহটাকে উঠোনে নিয়ে ফেলা হয়।

দুটি নারীর অঙ্গেই মূল্যবান অলঙ্কারাদি বর্তমান থাকায় এটা যে কোনো ডাকাতের কাজ নয় তা প্রমাণ হল। পোষাক-পরিচ্ছদ অক্ষত থাকায় ধর্ষণের প্রশ্নও টেকে না।

বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিটা আমার মনে প্রথম খটকা লাগায়। কোথায় গেল সে? আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে স্ত্রী ও কন্যা হত্যার মত দারুণ বিপর্যয়ের সংবাদ এখনো সে পায় নি। এ সংবাদ শোনবার পর পৃথিবীর কোনো শক্তিই তো তাকে আটকে রাখতে পারে না। তাহলে সে এখন কোথায় রয়েছে? না কি তাকেও···

এরপরই একজন ডিটেকটিভ আমায় খবর দিল যে নিরুদিষ্ট স্বামী এ সংবাদ শুনে অফিসের মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। যদিও এটা খুবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তবু মনে মনে স্থির করলাম লোকটি এলে তার পরবর্তী প্রতিটি প্রতিক্রিয়ার ওপর নজর করে দেখব আমি।

এক মিনিটের মধ্যেই একটা ট্যাক্সি এসে গেটে দাঁড়াল এবং তার থেকে নেমে এল ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখের ক্রন্দনরত এক কম্পিত মানুষ।

—আমার খুকী! খুকী কোথায়? হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোকটির প্রথম আর্তনাদ হল এই কথা দিয়ে।

—কোন খুকী? আমি বলে উঠলাম, আপনি যদি তরুণী মেয়েটির কথা বলে থাকেন স্যার তো অতীব খেদের সঙ্গে বলতে হয় যে সে—

—না না। আমি জানি মারিহা বেঁচে নেই। আমি বলছি আমার বাচ্চা খুকী ইয়ামিনের কথা। সে কোথায়?

এবার আমার পালা হতবাক হবার। তবে কি আরও একটি নরহত্যা সংযুক্ত হল? নাকি শিশুটি এই অপকর্মের সাক্ষী ছিল বলে তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে খুনী? হয়তো অপহরণই ছিল আসল 'মোটিভ'—ফলে এই দু-দুটি খুন। সে যাই হোক এখন এই অপহৃত শিশুটির পরিণতির ব্যাপারটাই খুনের ঘটনার চেয়ে বেশী প্রাধান্য পেল।

শোকাহত পিতাকে আমরা সিডাটিভ একটা বড়ি খাওয়ালাম। ফলে সে শিশুটির যথাযথ বর্ণনা দিতে সমর্থ হল। সাড়ে তিন বছর বয়েস, ঝাঁকড়া কালো চুল, ধূসর চোখ, কথা ভাল বলতে পারে না, জিভে আড়ষ্টতা আছে। শিশুটির গায়ে কি জামা ছিল সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই।

জনতাকে প্রশ্ন করেও কোনো খবর পাওয়া গেল না। কেউ এ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দেখেনি। কোনো সন্দেহজনক চিৎকার আর্ত-চিৎকারও এর আগে কারুর কানে যায়নি। এই শান্ত সমাহীত আইন মেনে চলা অভিজাত মানুষ অধ্যুষিত অঞ্চলে কোনো প্রকার সন্দেহজনক কিছু কারুর চোখে পড়েনি।

এতৎসত্ত্বেও কিনা দুটি অথবা তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে গেল এখানে!

মনটা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল শিশুটিই এ রহস্যের চাবি-কাঠি স্বরূপ। যে কোন উপায়ে তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় খুঁজে বের করতেই হবে। শিশুটিকে খুঁজে বার করবার জন্য সারা দেশময়

নির্দেশ দেওয়া হল। প্রতিটি পুলিশ স্টেশান, রোড পেট্রলের পুলিশ অফিসার ও রেডিও স্টেশনকেও সতর্ক করে দেওয়া হল। হেড কোয়ার্টারে আমরা সংবাদের প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

অসহ্য প্রতীক্ষায় সুদীর্ঘ দুঘণ্টা কাটলো। কোনো খবর নেই। প্রতিটি সেকেণ্ড কাটছে আর আমরা জানি খুনীর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়া ততই সহজতর হয়ে যাচ্ছে। শিশুটি যদি এখনো জীবিত থেকে থাকে তো তার প্রাণসংশয়ও ক্রমশঃ বাড়ছে।

আমরা প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি এমন সময় রেডিও রুম থেকে খবর এল আমাদের প্রার্থিত বর্ণনার একটি শিশুকে ডামাস্কাসের প্রাচীন শহরাঞ্চলে ভ্রমণরত অবস্থায় পাওয়া গেছে। যে পথটা মক্কার দিকে গেছে সে পথে বাচ্চাটি হাঁটছিল। শিশুটি এ বাড়িরই, তার হাতে একটা তাবিজে অ্যারাবিকে তার নাম লেখা ছিল। কিন্তু সাক্ষী হিসেবে ঐ পুচকে মেয়ে আমাদের কোনো কাজেই এল না। তার ক্লান্তি, ভয়, চোখের জল ও সর্বোপরি তার জিভের আড়ষ্টতা। সে কোথায় ছিল, কার সঙ্গে ছিল, কেনই বা ওখানে গিয়েছিল ইত্যাদি কোনো খবরই সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। শুধু বার বার বলা অস্ফুট একটি শব্দ অ্যারাবিক ভাষায় তার মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল, বোঝা গেল তা হল, আমার মামা।'

উক্ত লোকটিকে পাকড়াও করবার জন্য দিকে দিকে নির্দেশ গেল। যে সংবাদপত্র অফিসে উক্ত 'মামা' কাজ করে সেখানে সংবাদ নিয়ে জানা গেল সকালে সে অফিসে উপস্থিত ছিল কিন্তু পরে ছুটি নিয়ে চলে যায়। অফিসের পরে সে কোথায় গেছে জানা নেই কারুর।

প্রাচীন একটি প্রবাদে বলে অপরাধী অবশ্যই ফিরে আসে তার অপরাধ কর্মের অকুস্থলে। ক্রাইমের ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুর্নিবার কৌতূহল ও মনোবৈকল্যের অদ্ভুত তৃপ্তিসাধনের জন্য সে ফিরে আসে ঘটনাস্থলে।

একথা ভেবে আমরা উক্ত বাড়িটির নিকটে চারজন ডিটেকটিভকে

অগোচরে পাহারা রাখলাম। কিছুকাল পরেই ফোন পেলাম সন্দিগ্ধ চরিত্রের একজন লোক ঐ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে।

—লোকেরা এ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কি কি বলছে তা শোনবার জন্যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে খুবই আগ্রহী, ডিটেকটিভ অফিসার ফোনে জানায়, সে জনে জনে জিগ্যেস করে ফিরছে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা। নিজে কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করছে না।

আমরা তিনজন শিশুটিকে নিয়ে ঐ অঞ্চলে গেলাম। গাড়ির দরজা খোলামাত্রই শিশুটি 'মামা' বলে চিৎকার করে সেই আমাদের সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোকটির কোলে ঝাঁপিয়ে চলে গেল। এটাই সনাক্তকরণের পক্ষে যথেষ্ট। লোকটাকে গ্রেপ্তার করে হেড কোয়াটার্সে নিয়ে এলাম জবানবন্দী নেবার জন্যে।

লোকটির নাম আবদুল ওয়াহাব সাকা আমিনি, বয়েস তিরিশের ঘরে। শিশুটির মায়ের সাক্ষাৎ ভাই। লোকটি বার বার এক কথাই বলে গেল, তার বোন নাকি তাকে টেলিফোন করে বাড়ি আনে এবং বাচ্চা ইয়ামিনকে গরমের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে বাবদা নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। যেহেতু বাচ্চাটি নাকি ওর ভীষণ প্রিয়, নিজের মেয়ের মতই, তাই এ প্রস্তাবে সে সানন্দে সম্মত হয়। সে যখন ঐ বাড়িতে যায় তখন নাকি অস্বাভাবিক কিছুই তার লক্ষ্যে পড়ে নি, বাড়িতে কোনো অপরিচিত মানুষজনকেও দেখে নি। তার দিদি প্রাঙ্গণে বসে সেলাই করছিল।

আপনার এ কাহিনী সমর্থনের কোনো সাক্ষী আছে? হ্যাঁ আছে একটু ভেবে সে বললে, হামিন নামে আমার সহকর্মী এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। আমরা দুজনে মিলে বরফ শরবৎ খাই।

একটা ফোন কল করাতেই প্রথম শক পেল আমিনি। বন্ধু বলে উল্লিখিত লোকটা একথা সরাসরি অস্বীকার করে জানায়, বেশ কদিন ধরেই ওদের নাকি দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।

এর পর আমিনি একটু ভেবে ব্যাখ্যা করে বলে, ঐ হামিন গোপনে

একটা বেশ্যালয় চালায় তাই ও পুলিসের ব্যাপারে জড়িত হতে ভয় পায়।

বহুক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে ওকে জেরা করতে থাকি। এক সময় আমার ওর বাঁ হাতের প্রতি নজর পড়ল, দেখলাম ওর বুড়ো আঙুলের নখের তলায় বাদামী লাল রঙের একটা দাগ লেগে রয়েছে।

—এটা রক্ত হতে পারে না, আমি মনে ভাবলাম, বোধহয় ছাপাখানার কালি, অফিসে কাজ করবার সময় লেগে থাকবে। নোংরাও ছিল নখের তলায়। আবার মন বলে উঠল কোনো সূত্রকেই অবহেলা করা ঠিক হবে না।

দ্রুত লেবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণ হল নখের ময়লার মধ্যে রক্তচিহ্ন রয়েছে। এ সংবাদ শোনামাত্র ঐ 'মামা'টি একেবারে ভেঙে পড়ল এবং কালবিলম্ব না করে তার অপরাধকর্মের কাহিনী সবিস্তারে বলে গেল।

আমার দিদি খুবই দয়ালু স্বভাবের ছিল। আমি প্রায়ই যেতাম। যখনই আমার অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, চেয়েছি আর দিদিও দরাজ হস্তে আমায় তা দিয়েছে। গত রাত্রে জুয়াতে সব হেরে গিয়ে কপর্দক-শূন্য হয়ে পড়ি। আজ সকালে তাই দিদির কাছে গিয়েছিলাম। ছোট্ট ইয়ামিন গেটের কাছে খেলছিল আর দিদি উঠোনে সেলাই কল নিয়ে সেলাই করছিল। একথা সে কথার পর জানালাম আমার টাকা চাই, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন, এখুনি চাই।

—দুঃখিত ভাইজান, দিদি বললে, বাড়িতে আজ একটাও টাকা নেই।

আমি পিড়াপিড়ি করতে দিদি অধৈর্য হয়ে বলে, কেন জ্বালাতন করছিস, বলছি তো টাকা নেই আমার কাছে।

একটা কু-মতলব খেলে গেল আমার মনে। একতলায় কাবার্ডের মধ্যে যে জুয়েলারী রয়েছে সেটাকে হাতালে কেমন হয়।

—দিদি তোমার ঐ জুয়েলারীগুলো আমায় দাও, বলে আমি

বাড়ির ভেতর যেতে উদ্যত হই।

তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে দিদি—তোর লজ্জাশরম বলে কি কিছু নেই? অকৃতজ্ঞ জানোয়ার কোথাকার! আমাদের মায়ের গয়নাগুলো নিতে চাস তোর ঐ বদমাইসী আনন্দের জন্যে! বছরের পর বছর তোকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। আজ তোর এই বজ্জাতি ব্যবহারের কথা তোর জামাইবাবুকে সব জানাব। যা বেরিয়ে যা এখান থেকে আর কখনো আমার বাড়ি আসবি না।

দিদির এই ক্রুদ্ধ বাক্যগুলো আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে কাঠের হাতুড়িটা নিয়ে এলাম দিদিও পেছন পেছন এসেছিল, মারলাম মাথায় এক ঘা। দিদি রক্তাক্ত হয়ে পড়ে গেল। ওর দেহটাকে টেনে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিলাম।

বড় ভাগ্নি মেরিহা চিৎকার শুনে ওপরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দেখল আঘাত খেয়ে মা পড়ে গেল। সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল। ওর চিৎকার আমাকে বন্ধ করতেই হবে। দৌড়ে চলে গেলাম ওর ঘরে। ওকে শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করলাম, বুঝতে পারলাম না ও মরল কিনা। তাই আয়নাটা ভেঙে নিয়ে সেই টুকরো দিয়ে ওর কণ্ঠনালী কেটে দিলাম।

রাগ প্রশমিত হতে মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন লেগে গেলাম কি করে সবকিছু সূত্র লোপ করা যায়। আমি কেরোসিন তেল ঢাললাম সারা বাড়ীতে। তারপর আগুন দিয়ে পালাবার আগেই কাবার্ড থেকে যাবতীয় জুয়েলারীগুলি সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

গেটের কাছে ইয়ামিন খেলা করছিল। যাবার সময় ওকে তুলে বুকের কাছে সজোরে চেপে ধরলাম যাতে জামার রক্তের দাগগুলো না দেখা যায়। আমি ওকে বললাম, চল তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাই তারপর বাসে উঠে শহরতলীর দিকে চলে গেলাম।

বাড়ি ফিরে পোশাক পরিবর্তন করে নিলাম। ইয়ামিনকে রাস্তার অপরাপর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলতে দিয়ে আমি ফের চলে এলাম

দিদির বাড়ির কাছে লক্ষ্য করতে, এরপর কি ঘটনা ঘটছে। পরের ব্যাপার আপনার সবই জানা।

অতএব 'অপরাধী তার অপরাধস্থলে ফিরে আসবেই'—এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতায় আমরা বারো ঘণ্টার মধ্যেই ডবল মার্ডারের আসামীকে পাকড়াও করে ফেললাম। মনস্তাত্বিক সংস্কারই অপরাধী সন্ধানে আমাদের সাহায্য করল।

দণ্ডভোগও খুবই দ্রুত হয়ে গেল। এক সপ্তাহ বাদে আবদুল-ওয়াহাব সাক্কা আমিনির দেহ ডামাস্কাসের মেইন পার্কে ফাঁসীতে ঝুলন্ত হয়ে ভবিষ্যতের হবু-খুনীদের পক্ষে শিক্ষা ও দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রইল।

মামা-ভাগ্নে কাহিনী

(জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা)

জোহান্সবার্গের পুলিশ চীফ মেজর উইলিয়াম বিন্নি শুরু করলেন কাহিনী :

'আমি জানি আমার ছেলের নিশ্চয়ই ভীষণ কিছু একটা ঘটেছে' আমার অফিসে বসে বয়স্কা মহিলাটি কেঁদে কেঁদে বলে উঠলেন, 'তিন দিন আগে ছেলে আমার ভাইয়ের সঙ্গে খুঁড়ে গুপ্তধন বার করতে গাড়ি করে কোথায় যেন চলে গেছে। সেই থেকে ওর কোনো খবরবার্তা পাচ্ছি না। চিন্তাভাবনায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

ভদ্রমহিলার নাম মিসেস লুইসা মোলার। বিধবা মহিলা তাঁর ছেলেকে খুঁজে বার করে দেবার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়েছেন আটাশ বছরের ছেলে, নাম জন ফ্রেডারিক মোলার। ভদ্রমহিলার বিশ্বাস, ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন ?

'আপনি এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন ?' আমি বলি, 'আপনার ছেলে অপরিচিত কারুর সঙ্গে তো যায় নি, সে গেছে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে; গাড়িটা কোনো দুর্ঘটনায়ও পড়েনি, তাহলে আমরা অবশ্যই খবর পেতাম। মনে হয় যে গুপ্তধন খুঁজতে খুঁজতেই কিছু দেরী হচ্ছে।'

মিসেস মোলারের আশংকা কিছুতেই যায় না। 'উঁহু, আপনারা বুঝতে পারছেন না। আমার ভাইয়ের ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে। গতবার যখন সে পুলিশী ঝামেলায় পড়ে তখন সে গেয়ে বেরিয়েছে যে আমার ছেলেই নাকি ওকে ধরিয়ে দিয়েছে। সে অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যে। কিন্তু ভাই বলেছিল যে জেল থেকে বেরিয়ে জনকে দেখে নেবে। এক হপ্তা হল সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।'

মিসেস মোলার চলে যাবার পর আমি তার ভাই স্টিফানাস জ্যানউইক-এর নথিপত্র নিয়ে বসলাম। বছর পঁয়তাল্লিশ তার বয়েস।

যৌবনে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট-এর এক ফার্মে কাটিয়েছে। পরে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে ঘুরে নানাবিধ চালাকী ও কৌশলের দ্বারা কিছুদিন সংগ্রহ করেছে, চুরী দিয়েই জীবন আরম্ভ, শেষ দেড় বছর জেল খেটেছে কয়েকশ পাউণ্ড ছিনতাইয়ের অভিযোগে।

উল্টো-পাল্টা কথাবার্তা ধরন-ধারনের জন্য ওকে মানসিক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়। তার অভিমত, লোকটা পুরোপুরি পাগল নয়, তবে মাঝে মাঝে বুদ্ধি-বিকৃতি এবং কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভোগে।

যে অফিসারের ওপর ওর কেস ছিল তার বিশ্বাস যে কোনো না কোনো দিনই এই ভ্যানউইক সাংঘাতিক রকম কোন একটা অপরাধ করে বসবেই, এমন কি নরহত্যাও বিচিত্র নয়। কেননা শৈশবে এলিস্কটা নামে কয়েকটা বিড়ালকে লেজে লেজে বেঁধে লোহার রড দিয়ে আঘাত করে করে মেরে ফেলত এবং উক্ত বিড়ালগুলোর মরণ আর্তনাদ শুনে চরম উল্লাস প্রকাশ করত।

নথিপত্রে দেখা যায় ভ্যানউইক একটি এক নম্বরের মিথ্যাবাদী মানুষ। বাইরে কথাবার্তা অতি ভদ্র ও মিষ্টি ধরনের। এই মুখোশের সৌজন্যে সে অনায়াসে লোকের আস্থালাভ করে পরে তাদের আর্থিক চোট দিয়ে থাকে।

পরদিন আমি ভদ্রমহিলার ছেলে যে সুপ্রিম কোর্টের মাস্টারস অফিসে কেরানীর কাজ করে সেখানে তদন্ত করলাম। ব্লয়েমফন্টেন হল অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের রাজধানী, প্রখ্যাত হীরক খনি অঞ্চল কিমবার্লে থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে অবস্থিত। সেই ১৯৩০-এ এ শহরে ৩০০০০ শ্বেতাঙ্গ বাস করত। এ শহরে কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য অপরাধ বড় একটা সংঘটিত হতই না।

সুপ্রিম কোর্টের অফিসারবা আমায় বললে যে ক'দিন পূর্বে ভ্যানউইক এসে ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করে এবং দুজনকে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনায় রত দেখা যায়। মামা চলে গেলে ভাগ্নেকে খুবই

উত্তেজিত উল্লসিত দেখা যায়। সে একজন সহকর্মীকে ব
শীঘ্রই ১৫০ মাইল দূরস্থিত ওয়াটারভ্যাল অঞ্চলে এক
তলায় থাকা গুপ্তধন উদ্ধারে মামার সঙ্গে তাকে সাহায্য
যেতে হবে।

১২ই জুলাই তারিখে মোলার মামার সঙ্গে গাড়ি নিয়ে চলে রলেন সে গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্কে একটা গাঁইতি আর একটা শাবল গেছে। ওয়াটারভ্যাল হল সেই ফার্ম যেখানে ভ্যানউইক ঘটছে', হয়েছে। 'তিন

আমি সেখানে দুজন ডিটেকটিভকে পাঠালাম যদি তারা কে গাড়ি সংবাদ সংগ্রহে সক্ষম হয় সেজন্য। কয়েক ঘণ্টা বাদে ওদের কাছ থেকে বার্তা এক টেলিফোন কল পেলাম। ওরা বললে, মামা ভাগ্নে যেদিন দেয় সেদিন সন্ধ্যায় ভ্যানউইক নাকি সেখানকার পড়শী মিসেস গি তাঁর হফম্যানের সঙ্গে দেখা করে বলে যে তার গাড়িটা খারাপ হয়েয়েছেন। সারাবার জন্য একটা টর্চ প্রয়োজন, কেননা ঘুটঘুটে অন্ধকারমহিলার এসেছে। মিসেস হফম্যান-এর টর্চ না থাকায় তিনি বলেন যে রাতটা ইচ্ছে করলে সে তার বাড়িতে কাটাতে পারে। ভ্যানউইক সে প্রস্তাবে রাজী হয় না, বলে তাকে মাঝপথে থামলে চলবে না, এগিয়ে যেতেই হবে।

আমি ওয়াটারভ্যালে তল্লাসী করবার নির্দেশ দিলাম এবং পত্রিকায় মোলারের নিরুদ্দেশ কাহিনী ছাপিয়ে ভ্যানউইককে অনুরোধ জানালাম আমার অফিসে উপস্থিত হয়ে তদন্তকার্যে সাহায্যের জন্য। আমি ভাবিনি যে এ সহজ ফাঁদে সে আদৌ পা দেবে। কিন্তু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনটি পড়ে পরের ট্রেন ধরেই সে ব্লয়েমফন্টেনে এসে উপস্থিত হল। নিশ্চিত বুঝলাম ও ভেবেছে এ ব্যাপারে আমরা হতচকিত হয়ে গেছি এবং এও ভেবেছে যে আমরা ওকে সন্দেহই করিনি।

ইতিমধ্যে আমার লোকেরা ওয়াটারভ্যালে সদ্য নাড়াচাড়া হওয়া একটা শেয়ালের গর্ত আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুঁড়ে ফেলে

যৌবমোলারের বিকৃত শবদেহ পেয়ে গেল। প্রায় আড়াই ফিট মাটির থেকে তাকে পুঁতে রাখা হয়েছিল। দেহটা ছিল উপুড় করা অবস্থায়। পিঠে জামায় একটা ফুটো দেখা গেল এবং দেহেও একটা আঘাতের চিহ্ন। এটা নিশ্চয়ই কোনো তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাতে লেগেছে। প্যান্টের বোতাম দুটি ছেঁড়া।

পোস্টমর্টেমে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমি গাড়ি নিয়ে ওয়াটারভ্যালে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটা প্যারাফিন আলোর সাহায্যে শব-ব্যবচ্ছেদ হচ্ছিল। পুলিস দেখে দেখে মনটা শক্ত হয়ে

ও জন মোলারের শবদেহ দেখে আমরা কিঞ্চিৎ চমকে উঠলাম। মাথার খুলিটাকে ভাঙা ডিমের মত চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে এবং মেরুদণ্ডের তলায় যে আঘাত করা হয়েছে জীবিতকালীন যায়, তা নিশ্চয়ই অকল্পনীয় বেদনাদায়ক।

কঙ্কালের গর্তে কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল না। নিকটবর্তী একটা উনুনের মধ্যে গাঁইতি ও একটা শাবল পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল ভ্যান ডব্লুমার্কা দেওয়া কাদামাখা একটা মোজা। আমরা ব্রয়েমফন্টেনে ফিরে এসে দেখি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে ভ্যানউইক পুলিস স্টেশনে এসে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে।

'কাগজে পড়লাম আপনারা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন', ভ্যানউইক বললে একজন ডিউটি অফিসারকে, 'তাই প্রথম ট্রেন ধরেই চলে এসেছি। নিরুদ্দিষ্ট ভাগ্নেকে খুঁজে বার করতে আমি আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানানো হল যে মোলারের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভাগ্নেকে হত্যার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। ডিউটি অফিসার ওর কোন বিবৃতি নিতে অস্বীকার করল এইজন্য যে পরে হয়তো ও অস্বীকার করে বলবে পুলিস আমাকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছে ঐ মিথ্যা বিবৃতি দিতে।

এর অল্পকাল পরেই আসামীপক্ষের আইনজীবি ওয়াটারভ্যালে

গিয়ে উক্ত ট্রাজেডির পুনরাভিনয় করবার জন্য আদালতে আবেদন পেশ করে। আবেদন মঞ্জুর হলে একজন ডাক্তার, একজন ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে আসামীসহ ওরা গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। সেই শেয়াল গর্তের কাছে গিয়ে ভ্যানউইক তার বিবৃতিমাফিক ঘটনা স্মরণ করে পুনরানুষ্ঠানের সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করে।

আসামী বিবৃতি দেয়, বছরখানেক পূর্বে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ৬০০০ পাউণ্ডের নোট একটা বাক্সে পুরে সে গ্রেপ্তার হবার আশংকায় একস্থানে পুঁতে রেখেছিল। এবার ভাগ্নেসহ সেখানে যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যায়।

আমরা গিয়ে সে স্থানে হাতখানেক তফাতে দুটো গর্তের চিহ্ন পাই', ভ্যানউইক বলে চলে, 'কিছুতেই মনে করতে পারছি না কোন গর্তের নিচে গুপ্তধন রেখেছিলাম। ঠিক করলাম দুটো গর্তই খোঁড়া হবে। বেশ খানিকটা মাটি তোলবার পর শাবল ফেলে গাঁইতিটাকে হাতে নিলাম। ভাবলাম এর আঘাতে হয়তো লুকোনো বাক্সের উপর চাপা দেওয়া পাথরটার হদিশ পেতে পারি।

'মোলার বলল তার তেষ্টা পেয়েছে এবং জানতে চাইল জল কোথায় পাওয়া যাবে। আমি বললাম ঐ দূরে একটা জলের কল আছে। সেটা দেখবার জন্যে ও প্রায় চিৎ হয়ে সে দিকে তাকায় গর্তের কিনারা থেকে। আমার মনে হল তখনই গাঁইতির ফলার আঘাত ওর পায়ে লেগে থাকবে। আমি পেছন ফিরে দেখলাম ও টাল সামলাবার চেষ্টা করছে। আমি গাঁইতি ফেলে দিয়ে ওকে ধরবার চেষ্টা করি। কিন্তু ও গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। পড়বার মুখে ওর ধাক্কা লেগে আমিও পড়ে যাই। ঠাস্ করে একটা শব্দ হয়!

আমি গর্তের মধ্যে ওকে আঁকড়ে ধরি। কিন্তু ওর দেহ যেন কেমন এলিয়ে গেছে মনে হয়। গাঁইতিটা দেখলাম ওর মাথার নিচে পড়ে রয়েছে, আর দেখলাম ও সাংঘাতিক আহত হয়েছে। এর পর সব কিছু অন্ধকার ঝাপসা হয়ে যায় আমার কাছে। আমি এখনো

সঠিকভাবে কি ঘটেছিল স্মরণ করতে পারছি না। মনে হয় ঘটনার আকস্মিকতায় ও দারুণ শক্-এর দরুনই আমার ওরকম অবস্থা হয়েছিল।'

ওর আইনজীবি প্রশ্ন করেন, 'এর পর আর কি আপনার স্মরণে আছে?'

'আবার হুঁশ হতে দেখি আমি আমার গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। আমার কিরকম অর্ধচেতন অবস্থা তখন। আমার ইচ্ছে হল চিৎকার করে উঠি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাহোক কিছু একটা করি, কিংবা নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। এর পর গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে চলে যাই। আমার আর এক মুহূর্তও ওখানে থাকতে প্রাণ চাইছিল না।'

তারপর শুরু হল ঘটনার পুনরনুষ্ঠানের অভিনয়। ভ্যানউইক গাঁইতি হাতে তুলে নিল, ওর আইনজীবি করল ভাগ্নে মোলারের পার্ট, ও যা যা বলছে সে রকম অভিনয় হতে থাকল। সঙ্গের ফটোগ্রাফার নানা অ্যাংগেলে ফটো নিলো। সব কিছুতে দেখানো হল যে দোলায়মান গাঁইতি দ্বারা ভ্রমক্রমে ভাগ্নের পিঠে আঘাত লেগেছিল। উপস্থিত ডাক্তারও বললেন যে মোলারের আঘাত-প্রাপ্তি ও মৃত্যু এ ধরনের দুর্ঘটনাবশতই হওয়া সম্ভব। আসামী ভ্যানউইকের বিবৃতি যথার্থও হতে পারে।

আসামী অবশ্য একথার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি কেন সে তার কাদামাখা মোজা পরিত্যাগ করে নিয়েছিল আর শাবল এবং গাঁইতিটা অদূরে একটা নালার মধ্যেই বা কে ফেলল। তার সেই এক কথা—তখন মানসিক অবস্থা তার অন্ধকার ও ঝাপসা থাকায় কিছুই সে ভালোমত স্মরণ করতে পারছে না।

আসামী ইতিপূর্বে কিছুকাল উন্মাদাগারে থাকায় এটা প্রমাণ করা তার পক্ষে সুবিধে হল যে দুর্ঘটনার সময় সে অ্যাম্‌নেসিয়া রোগাক্রান্ত হয়েছিল। মানসিক ডাক্তাররাও অভিমত দিল যে ঘটনাকালীন ওর

মানসিক অন্ধকার নেমে আসা স্বাভাবিক।

মামলা চলল। সাক্ষী-সাবুদ, ফটোগ্রাফ, আসামী পক্ষের আইনজীবির জোরালো বক্তৃতা সবই হল। জুরীগণ তিন ঘণ্টা শলা-পরামর্শের পর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন 'নট গিলটি'-তে। আসামী নিরপরাধ। ভ্যানউইক কাঠগড়া থেকে মুক্ত পুরুষরূপে বেরিয়ে চলে গেল।

পরদিন রাস্তায় জুরীদের একজন আমায় থামিয়ে অনুশোচনার কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন ঐ সিদ্ধান্ত ছাড়া আমাদের করবারই বা কি ছিল বলুন? আমরা বুঝলাম জজসাহেব আসামীর মুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তাই আমরা তো তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না, পারি কি?'

'দেখুন, একটা ভবিষ্যৎবাণী করে দিচ্ছি', আমি জুরী সায়েবকে বললাম, 'আপনি দেখবেন এই ভ্যানউইক ছ'মাসের মধ্যেই কোনো একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। দ্বিতীয় বারে কিন্তু সে এভাবে দণ্ড এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে না। তবে কিনা শুধু শুধু আরেকটি কোন নিরীহ মানুষ নিহত হয়ে যাবে ওর হাতে। অকারণে প্রাণ যাবে আরেকটি বেচারার।'

তিন মাসের মধ্যেই আরেকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। নিহত ব্যক্তি ট্রান্সভালে প্রিটরিয়ার ফার্ম-মালিক জনৈক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক। নাম তার সিরিল গ্রিগ টাকার। তার দেহটাকে একটা বাক্সে পুরে তারই বাগানের মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছিল। পাশের ওয়াগন হাউসের মধ্যে পাওয়া গেল পিটিয়ে মারবার অস্ত্র একটি বিশালকায় রক্তাক্ত হাতুড়ি।

সন্দেহভাজন ব্যক্তির শারীরিক বর্ণনা সহ একটি সার্কুলার প্রচারিত হল দেশের যাবতীয় পুলিস-স্টেশনে। লোকটি দোহারা চেহারার, ঝাঁটা গোঁফ ও টাক পড়ে আসা মস্তক। মনে হয় ফ্রি স্টেটের অধিবাসী। ফর্মটা কেনার ব্যাপারে সে নাকি টাকার-এর সঙ্গে

ব্যবসায়িক আলোচনা চালাচ্ছিল।

আমার ভবিষ্যৎবাণী অর্ধেক সময়ের মধ্যেই ফলে গেল। ছ'মাস নয়, তিন মাসের মধ্যেই শয়তান ভ্যানউইক আরেকটি বীভৎস নরহত্যা সংঘঠিত করে ফেলল। এবার আর মানসিক বিকৃতির অজুহাত টিকলো না। আদালতের জুরীরা একবাক্যে দোষী সাব্যস্ত করলেন আসামীকে।

ভ্যানউইকের প্রাণদণ্ডাদেশ হয়ে গেল। শেষ ক'টা দিন সে বাইবেল পাঠ করে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে কাটাল।

১৯৩১-এর ১২ই জুন তার ফাঁসি হয়ে গেল।

এরপরই একদিন মিসেস মোলার এলেন আমার কাছে। মৃত্যুর পূর্বরাত্রিতে তাঁর কাছে লেখা ভাইয়ের একটি পত্র তুলে দিলেন আমার হাতে।

তাতে লেখা ছিল ঃ

'দিদি লুইসা,

আমি তোমাকে শোকাহত করে যে আঘাত দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা চাইতে তোমার কাছে যেতে পারলাম না। দিদি, আমিই তোমার নয়নের মণি সন্তানকে হত্যা করেছিলাম। যীশুর কথা স্মরণে রেখে আমায় মার্জনা ক'রো।

আমি স্বীকার করছি বিনা কারণেই তাকে আমি হত্যা করেছিলাম। জীবনে ঐ একটিমাত্র মামলায়ই জিতেছিলাম। আমি আগাগোড়া সে মামলায় মিথ্যাচার চালিয়ে গেছি। অপরাপর মামলা আমি হেরেছি, আমি সত্যনিষ্ঠ ছিলাম।

ইতি

অনুতপ্ত ভ্যানউইক

দ্বিতীয় হত্যাটি করেছিল ভ্যানউইক যেহেতু তার মনে ছিল অদম্য লোভ এবং অপরাধপ্রবণতা। জাল দলিলের সাহায্যে ফার্মটি নিয়ে

নেবার তালে ছিল সে। ভেবেছিল টাকার-এর মৃতদেহ কখনোই আবিষ্কৃত হবে না। একটা নরহত্যায় যখন সে পরিত্রাণ পেয়েছে, দ্বিতীয়টায়ও অবশ্যই পাবে এই ছিল তার ধ্রুব বিশ্বাস।

যদি সে প্রকৃতই ভেবে থাকত যে শেষ রাহাজানির সংবাদ পুলিসে দিয়েছে তার ভাগ্নে স্বয়ং, তাহলে হত্যার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু তার বিবৃতি মতে দেখা যায় যে ভাগ্নে তার গুপ্তধন উদ্ধারকার্যে স্বয়ং স্বইচ্ছায়ই গিয়েছিল, তাহলে তার মৃত্যুটা দুর্ঘটনাবশতঃই প্রমাণ হয়।

কিন্তু অনুশোচনার অগ্নিতে জ্বলে সে শেষ সময়ে যে চিঠি দিদিকে দিয়ে যায় তাতে করে শোকাহতা ভগ্নীর জন্য এই আশ্বাসবাণী রেখে গেছে যে তাব সন্তান এমন কিছু অন্যায় করেনি যার জন্য তাদের পরিবার লজ্জিত হবে।

সমস্ত জঘন্যতার মধ্যেও জীবনে বুঝি একটামাত্র মন্দের ভাল কাজ করে গেল নৃশংস খুনী ভ্যানউইক ইহলীলা-সংবরণের পূর্বমূহুর্তে।

মানুষের চামড়ার দস্তানা

(সিডনী, অস্ট্রেলিয়া)

সিডনীর প্রাক্তন পুলিস কমিশনার ওয়াল্টার হেনরী চাউল্ডস বললেন ঃ প্রাচীন যুগ থেকে পুলিস বিভাগে কাজ করে যাওয়ায় আমি আমার কর্মজীবদ্দশায় দেখলাম একটা জংলা শহর থেকে সিডনী ক্রমে ক্রমে দশ লক্ষ লোকের বিশাল নগরীতে পরিণত হল। এবং ভালয় মন্দে অপরাধ ও ক্রাইমে দুনিয়ার তাবড়-তাবড় রাজধানীর সমকক্ষ হয়ে উঠল।

বহু উত্থান পতন ও কঠোর পথ বেয়ে আমি একসময় নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এর কমিশনার পদে উন্নীত হই। কনস্টেবল থেকে কমিশনার এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে, যার মেয়াদ ছিল পুরো তেতাল্লিশ বছর, আমি ছিঁচকে চোর থেকে খুনী পর্যন্ত যাবতীয় অপরাধীকুলকে চিনে ফেলেছিলাম, জেনে ফেলেছিলাম।

এ শতাব্দীর শুরুতে আমি সিডনীর পুলিস হেডকোয়ার্টারে মিসিং পারসন্স ব্যুরোতে সার্জেণ্টরূপে কাজ করছিলাম। ফিংগার-প্রিণ্ট পদ্ধতি সবে চালু হয়েছে। আর অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতেই সর্বপ্রথম আমি অপরাধী নির্ণয়ে এই বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রবর্তন করি।

আমি নিজেও খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম ফিংগার-প্রিণ্ট প্রক্রিয়ার। সাউথ ওয়েল্‌স্‌ জেল কয়েদীদের ৮০০০ জনের আঙুলের ছাপ ছিল আমাদের কাছে। হাতের ছাপের লাইন সমূহের যাবতীয় জটিলতা আমি চেষ্টা করে করে শিখে ফেলেছিলাম। সে সময় এ কাজের জন্য মাত্র পাঁচজন লোক ছিল অফিসে। আর আজ সারা অস্ট্রেলিয়ার দশ লক্ষ অপরাধীর ফিংগার প্রিণ্টের ফাইলের জন্য লোক নিযুক্ত আছে প্রায় একশো নরনারী। শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, নিউজিল্যাণ্ড এবং

অপরাপর প্যাসিফিক দেশগুলির ফাইলও এখানে রয়েছে। এইভাবে সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হেডকোয়ার্টার হয়ে উঠেছে নিউ সাউথ ওয়েল্স্।

আমার যৌবনের শেখা ফিংগার প্রিন্ট সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে যাওয়াটা ভবিষ্যতে সেই 'মানুষের চামড়ার দস্তানা' কেস-এ খুব সাহায্য করেছিল।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বড়দিন, আমি তখন কয়েক বছরের পুরনো কমিশনাররূপে কাজ করছি, সে সময় মাছ ধরতে যাওয়া দুজন লোক মুরামব্রীজ নদীতে একটি মৃতদেহ অবিষ্কার করে।

হত্যাকাণ্ডের পর দেহটা জলে ফেলে দেওয়া হয় এবং তা ভাসতে ভাসতে তীরভূমি থেকে নুয়ে পড়া গাছের ডালে আটকে ছিল। ফুলে পচে সে শব সনাক্তকরণের পরিপূর্ণ বাইরে চলে গেছে।

আমি জানি এ শবের সনাক্তকরণের একমাত্র পথ হল আঙুলের ছাপ তোলা। তাছাড়া নান্য পন্থা। তাতেও যে সনাক্তকরণ সম্ভব হবে এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই। কেননা মৃত ব্যক্তি হয়তো একজন নিরপরাধ সুস্থ নাগরিক। তার ফিংগার প্রিণ্ট তাই পুলিস ফাইলে থাকা অসম্ভব। নিউ সাউথ ওয়েল্স্-এর সেই সেই নাগরিকদেরই আঙুলের ছাপ রাখা হয় যারা কোন কোন না সময়ে কোনরূপ অপরাধ করে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল।

তদন্তকারী অফিসাররা এ কেসটির তদন্তে অগ্রসর হবার পূর্বেই আমি চীফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রায়রকে বলেছিলাম, তোমার সহকারীরা আর যাই করুক মৃতদেহের একটা ফিংগার প্রিণ্ট যেন আনে। সেটাই হয়তো হবে লোকটাকে সনাক্তকরণের একমাত্র উপায়।

প্রায়র ও ওয়াজ্ঞার পুলিসরা যেখানে শব পাওয়া গেছে নদীর সে অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে। কোথায় হত্যা করা হয়েছে তা কেউ বলতে সক্ষম হল না। কেননা মেরে দেহটা হয়তো

উজানে বা ভাটিতে বহুদূর স্থান থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তারপর সেটা ভাসতে ভাসতে এখানে এসে আটকে গেছে। মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল তার ডান বাহুটা একেবারেই নেই। মনে হল তাহলে হয়তো সনাক্তকরণের শেষ সুযোগটিও অন্তর্হিত হয়েছে।

কিন্তু তল্লাসীকালে একজন ডিটেকটিভ নদীর জলের তলায় ঝাঁঝির বাদামি রঙের ছোট্ট একটা থলেমতন আবিষ্কার করল। সে নীচু হয়ে সেটাকে তুলতে গিয়ে সভয়ে দেখল যেটা ভেবেছিল বাদামী থলে সেটা আসলে ভেতর ফাঁপা ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ওপরকার চামড়া।

সেটাকে সযত্নে পার্শেল করে হেডকোয়ার্টারে ফিঙ্গার প্রিন্ট বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্টও ওটাকে বুড়ো আঙুলের চামড়া বলেই স্বীকার করলে।

ওয়াঙ্গা পুলিসেরা সংবাদ দিলে মৃতের কব্জী পোকারা খেয়ে ফেলেছে। দেহ যখন এসে আটকে যায় তখন ডান হাতটি কনুই থেকে জলের উপরে খাড়া অবস্থায় ছিল। তখন ম্যাগটস্‌রা (পোকা) বাইরের চামড়া রেখে কুরে কুরে ভেতরের মাংস সব খেয়ে ফেলে দিয়েছে। দেহ তোলবার মুখে সেটা ছিঁড়ে যায়। ফলে ডিটেকটিভরা পেল প্রকৃতপক্ষে যাকে বলা যায় একটি 'মানুষের চামড়ার দস্তানা'।

ঠিক এই বস্তুটিই আমাদের প্রয়োজন ছিল কাজে এগিয়ে যাবার জন্য। আমি ভুলব না কি সাংঘাতিক নাটকীয় চাঞ্চল্য জেগেছিল সেদিন পুলিস ল্যাবরেটরীতে। পুলিস সার্জন মৃতের চামড়াটাকে জলে ভিজিয়ে নরম করে তুলেছিল।

পুলিস সার্জন একজন ডিটেকটিভকে হাতে সার্জিক্যাল দস্তানা পরতে বলল। সার্জন চামড়াটাকে ফাঁক করে ধরল আর ডিটেকটিভ তার দস্তানা সমেত সে হাত ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে। প্রায় নিখুঁত ভাবে ওটা হাতে ফিট করে গেল। ডিটেকটিভ তখন কালির প্যাডে আঙুল চেপে নিয়ে কাগজের ওপর ছাপ রাখল—এবং সেটা হল

তথাকথিত মৃত ব্যক্তিরই ফিংগার প্রিন্ট মানুষের চামড়ার দস্তানার সাহায্যে।

ছাপ নিলেই হবে না, এরপর রয়েছে দীর্ঘ সময়ের অনুসন্ধান কার্য। লক্ষ লক্ষ কপির সঙ্গে মিলিয়ে আসল ছাপটি উদ্ধার করা খুবই সময়সাপেক্ষ ও ধৈর্যের পরীক্ষা।

মৃতদেহটা এখনও পড়ে আছে ওয়াজ্ঞা মর্গে। এখন তার বাঁ হাতের ছাপও প্রয়োজন। সে হাতও পোকায় কেটে খোল করে দিয়েছে।

ঐ বীভৎস ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় তিনজন ডিটেকটিভ সাদা গাউন, টুপী ও মুখোশ পরে ডাক্তারকে সাহায্য করল। পরে অপারেশন অন্তে চামড়াটাকে যত্নসহকারে প্যাক করে পুলিস হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে আগের মত 'মানুষের চামড়ার দস্তানা' প্রক্রিয়ায় মৃতের বাঁ হাতের ছাপও নেওয়া সম্ভব হল।

এবার শুরু হল সেই বিরক্তিকর অনুসন্ধান কর্ম। পাঁচলাখ হাতের ছাপের সঙ্গে এ-ছাপ মেলানো পর্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরীক্ষা করে দেখবার পর অকস্মাৎ সাফল্য এল। ভাগ্যক্রমেই বলতে হবে মিলে গেল একটা ছাপের সঙ্গে।

ডিটেকটিভ প্রায়র ফিংগার প্রিন্টের মালিকের অর্থাৎ মৃতদেহের যে বর্ণনা দিল তা এই রকম ঃ 'চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বয়েস, ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে, মাঝারি গড়ন, দাড়ি গোঁফ কামানো, ওজন অনেকটা ১০ স্টোন ৭ পাউণ্ড। উপর ও নিচের কয়েকটা দাঁত নেই, পরনে কালো টিউনিক ইউনিফর্ম, ধূসর রঙের ফ্লানেল শার্ট নীল রঙের ট্রাউজার, আট নম্বর সাইজের বুট, কোন মোজা নেই।'

লোকটার নাম হল পার্সি স্মিথ। আমরা সংবাদপত্রে সংবাদটা ফাঁস করলাম না। কেননা ওর মৃত্যুর কথাটা চেপে গিয়ে ওর সম্বন্ধে গোপনে কিছুটা অনুসন্ধান করে নেওয়াটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে খুনী না টের পায়। বছর চার আগে স্মিথ মদমাতাল

ঝামেলাকারী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছিল দেখা যায়।

আমাদেরই বরাত বলতে হবে পার্সি স্মিথের খবরাখবর সহজেই পাওয়া গেল। ভীষণ তোতলা ছিল বলে অনেকেই তাকে স্মরণ করতে পারল। ছোট ওয়াগন করে স্মিথ সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াত নানাবিধ কাজ কর্ম করে। বেকারী ও মন্দার বছরগুলিতে অপরাপর লোকদের মত সে কাজ যত অল্প সময়ের কাজই হোক না কেন সে করে বেড়িয়েছে।

বহু দীর্ঘ তদন্তের পর আমরা অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওর গতিবিধির হদিশ পেলাম। মোরে নামক জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে স্মিথকে ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে দেখা গেছে। সে দিনটায় যেখানে ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছে তারই কয়েক মাইলের মধ্যে ওর ছোট্ট ওয়াগনটিকে দেখা গিয়েছিল।

১৯শে ডিসেম্বর স্মিথকে দেখা গেছে তার ওয়াগনের উপর। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায় যখন মোরে একদল বেকার কর্মীদের ক্যাম্পে একাই ফিরল তখন তার তাঁবুতে অনেকে রক্তের দাগ দেখে। মোরে একটা ঘোড়া ও অপর কতগুলো ব্যক্তিগত সামগ্রী বিক্রী করে—যেগুলো পরে প্রমাণিত হয়েছে স্মিথের বলে।

মোরেকে জেরা করবার উদ্দেশ্যে তাকে ধরে আনবার জন্য পরোয়ানা জারি করা হল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আমরা দেখলাম আমাদের প্রার্থিত লোক সে মুহূর্তে জেলের অভ্যন্তরে আটক আছে। বড়দিনের কয়েকদিন বাদেই সামান্য একটা অভিযোগে স্থানীয় লক আপে সে দু-সপ্তাহের জন্য বন্দী আছে।

ইতিমধ্যে আমরা জেমস এগুিস নামক ওয়াঙ্গার জনৈক গারেজ-মালিকের কাছে সংবাদ পেয়েছি যে ১৬ই ডিসেম্বর মোরেকে সেখানে দেখা গেছে। এর চারদিন বাদে একটা ওয়াগন নিয়ে তার কাছ থেকে নগদ টাকায় সেটা রিপেয়ার করিয়ে নিয়ে যায়।

যখন সেলে-এর মধ্যে ওকে জেরা করি তখন মোরে বললে ওয়াঙ্গার

নিকট ও ডাউড নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে ওয়াগন কিনেছে।

অন্যান্য লোকের কথার সঙ্গে ওর কথা আদৌ মিলল না। ওকে স্মিথের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল।

১৯৩৪-এর ৮ই মে ওয়াঙ্গা কোর্টে যেদিন মামলা শুরু হল সেদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল আদালত। বহু মহিলাও উপস্থিত ছিল সেখানে। মোরেকে কাঠগড়ায় বেশ নার্ভাস দেখা গেল। সাক্ষীর পর সাক্ষী এসে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে লাগল।

একজন সাক্ষী ওকে গাড়ি থেকে একটা রক্তাক্ত তাঁবু নামাতে দেখেছিল। সে ওকে এর দরুন জিজ্ঞাসা করাতে মোরে নাকি ক্রুদ্ধভাবে বলেছে, চোপরাও, নিজের চরকায় তেল দাও। সব ব্যাপারে নাক ঢোকাতে যেও না।

সেই গ্যারেজ-মালিক বললে, গাড়ি সারাবার সময় সে গাড়িতে ক্যানভাসের তলায় রক্তমাখা ছুরি দেখেছে।

এ সাক্ষীও পাওয়া গেল, যে বললে মোরে 'এস' লেখা একটা হাতঘড়ি ও একটা স্মিথের গায়ের জ্যাকেট বাজারে বিক্রি করেছে।

একজন প্রধান সাক্ষী পাওয়া গেল, যার নাম জোন্স। সে পুলিসকে জানায় যে একদিন সে দেখে মোরে ও স্মিথ দুজনে সাংঘাতিক কলহে লিপ্ত হয়েছে। মোরে সেদিন স্মিথকে খুন করে ফেলবে বলে শাসিয়েছিল।

এই জোন্সকে যেদিন সাক্ষী হিসাবে কাঠগড়ায় ডাকা হয়, দেখা গেল সে অনুপস্থিত। সেদিনকার মত কোর্ট মুলতুবি রইল। পরদিন ফের কোর্টে ডাক পড়ল তার। তখন তার পরিবর্তে একজন পুলিস অফিসার এগিয়ে এসে জানাল, ক্রাউন পক্ষের সাক্ষী নিহত হয়েছে। তাঁর মাথার পেছনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়।

পরে জানা যায় যে নিহত জোন্সের স্ত্রী মোরের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। স্ত্রীকে স্বামী-হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে প্রমাণ হয় ওটা নেহাত একটা দুর্ঘটনাবশত মৃত্যু। স্ত্রী খালাস পেয়ে যায়।

মামলা চলতে লাগল। জুরীগণ মনোযোগ সহকারে মামলার বিবরণ অনুধাবন করে চলল। পরে এল আমাদের ফিংগার প্রিণ্ট ডিপার্টমেণ্টের সাক্ষ্য। তারা জানাল কি ভাবে তারা 'মানুষের চামড়ার দস্তানা' প্রক্রিয়ায় মৃত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেছে। আগাগোড়া মোরে নিজেকে নিরপরাধ বলে গেল। ওর পক্ষের উকীলও বললে আসামীর বিপক্ষে শুধুমাত্র সারকমস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স-এর ভিত্তি নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কিন্তু সরকার পক্ষের প্রসিকিউটার জানালেন, হতে পারে তা, কিন্তু সেগুলো এতই গুরুতর ও স্পষ্ট যে তার দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে যে মোরে হল প্রকৃত হত্যাকারী।

জুরীরা একবাক্যে জানাল মোরে 'অপরাধী'। মৃত্যুদণ্ডাদেশ হল। সেই দণ্ডাদেশ শুনে মোরে সহসা নিজগলায় বারেক হাত বুলিয়ে গলার টাইটাকে ধরে টানতে লাগল।

পরে আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল তার।

কিন্তু ১৯৫৩-র ১লা ডিসেম্বর সে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হওয়ায় জেল থেকে খালাস পেল। তখন তার পুরো বিশ বছর কারাদণ্ডভোগ হয়ে গেছে।

মাথার খুলি

(মস্কো, রাশিয়া)

মস্কোর পুলিস কমিশনার গ্রেগরি আরেনস্কি বললেন ঃ

আমরা রাশিয়ানরা মানুষজনের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি বা দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্ট প্রভৃতি দিয়ে আমাদের দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরি না। নোংরা যে সব হতভাগ্য মানুষ স্বভাবদোষে অপরাধ করে বসে তাদের কাহিনীও প্রচার করতে আদৌ উৎসাহ বোধ করি না!

সর্বদাই আমরা এই সব নগণ্য ব্যাপারের চেয়ে বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়েই চিন্তা করি। যে সব জটিল সমস্যাদি আমাদের দেশের এবং সারা বিশ্বের মানুষের পক্ষে সমাধান করা প্রয়োজনীয় সে সব ব্যাপারই আমাদের কাছে সমধিক গুরুত্ব পায়। এর অর্থে এই বোঝায় না যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের সম্মানবোধ কম, বরং আমরা চাইনা যে মানুষরা এইসব দণ্ডভোগী চোর ছ্যাঁচোর খুনী ধর্ষণকারীদের কাহিনী পড়ে যেন অপরাপর মহান সমস্যাবলীর প্রতি ঔৎসুক্য না কমিয়ে দেয়।

এতৎসত্ত্বেও যখন সারাবিশ্বের পুলিস সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে নিজ নিজ জীবনের উল্লেখযোগ্য অপরাধ কাহিনী বলবার সুযোগ এসেছে, তখন তাহলে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বলে যাই।

মনে পড়ে সেটা ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষাশেষি এক ঠাণ্ডা গ্রীষ্মের রাত। মস্কো মেট্রোর অন্যতম এক ইন্সপেক্টর তার কাজ শেষ করে বাড়ির পথে রওনা হয়েছিল। আরকেডি গুরেলেভিচ নামক সেই লোকটিকে আমি সবিশেষ চিনতাম। দক্ষকর্মী, চমৎকার কমরেড এবং সদাশয় পড়শী।

একই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে আমরা বাস করতাম। আরকেডি চারতলায়, আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে একতলায়। আমাদের ছেলে

মেয়েরা একসঙ্গে রিক্রিয়েশন সেণ্টারে খেলা করত, একই স্কুলে পড়তে যেত এবং পাবলিক স্কুলে আমাদের দুপরিবারের সবাই একসঙ্গে মিটিং, অভিনয় বা সামাজিক কোন জমায়েতে যোগ দিতাম।

পঁয়তাল্লিশ বছরের আরকেডি ভালোবাসতো দুটি জিনিস, এক কম্যুনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় ফুটবল খেলা।

সেদিন সাবওয়ের কাছ থেকে যখন সে বাড়ির পথে রওনা দেয় তখন গভীর রাত, রাস্তা ক্ষীণালোকে আলোকিত এবং জনমানবহীন!

সহসা একজন ক্ষিপ্ত উন্মাদ মানুষ ভীষণ জোরে ছোট একটা গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় মোড় ঘোরবার মুখে সশব্দে ব্রেক কষে ঘোরাতে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে এসে আরকেডিকে এমন প্রবলভাবে ধাক্কা মারে যে ইন্সপেক্টরের দেহ উইণ্ডশিল্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

গ্রেপ্তারের ভয়ে ড্রাইভার গাড়ি না থামিয়ে আরকেডির দেহ নিয়েই বেশ কিছুদূর ঐ অবস্থায় যায়। অতঃপর আরকেডির রক্তাক্ত আহত দেহ প্রায় আমাদের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের সামনা-সামনি ফেলে চলে যায়। ড্রাইভারটি মারাত্মক গতিবেগে গাড়ি নিয়ে উত্তর দিকে শহরতলীর পথে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়।

প্রায় ছজন নরনারী ব্রেক কষার মুখে টায়ারের আর্তনাদ এবং গ্লাস ভাঙ্গার শব্দ শুনেছিল। শুনে বেরিয়ে আসে রাস্তায় এবং দেখে সেই আহত মানুষটিকে।

একজন দৌড়ে এসে আমার দরজায় বেল বাজিয়ে আমায় জাগিয়ে বলে যে কমরেড গুরেলেভিচ-এর ভীষণ এক অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। আমি অ্যাম্বুলেন্সে টেলিফোন করি এবং আমাদের ডিস্ট্রীক্টএর পুলিসকেও সংবাদটা জানিয়ে দিই।

আমি যখন বাইরে এলাম আরকেডি তখনও রাস্তায় পড়ে আছে। কে একজন ভারী একটা কম্বল তার গায়ে চাপা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওর দেহটা এত বেশী নিথর ছিল যে ক্ষণেকের জন্যে আমার মনে

হল যে ও মারা গেছে।

অবশ্য নীচু হয়ে বুঝতে পারলাম ওর ক্ষীণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে। ওর মাথায় দেখলাম একটা বীভৎস ক্ষত চিহ্ন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স এবং কয়েকখানা পুলিসের গাড়ি এসে উত্তেজিত ও ভীত জনতাকে সরিয়ে অকুস্থলে এসে থামল। আরকেডির স্ত্রী ট্যানিয়া উন্মাদিনী প্রায় হয়ে কাঁদছিল যখন দেখলো তার প্রায় মৃত স্বামীর দেহ স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

লোকটা ওকে মেরে ফেলেছে, একেবারে মেরে ফেলেছে গো। চিৎকার করে কাঁদছিল ট্যানিয়া এই কথা বলতে বলতে। পড়শী মেয়েরা ওকে শাল দিয়ে জড়িয়ে ধরে যতদূর সম্ভব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল।

পুলিস অফিসার সাক্ষীদের নানা প্রশ্ন করলো কিন্তু কেউই কোন সঠিক সংবাদ দিতে পারল না, শুধু জানাল তারা মাত্র শব্দ শুনেছে টায়ারের আর কাঁচ ভাঙ্গার। বেরিয়ে এসে ঐ শীতার্ত ঠাণ্ডায় আরকেডিকে মরণাপন্ন অবস্থায় দেখেছে মাত্র।

যেহেতু পেশাগত এবং ব্যক্তিগত ইণ্টারেষ্ট রয়েছে এই কেস-এ তাই আমি একটি পুলিস ভ্যানে করে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন পেছন গেলাম গর্কী হাসপাতালে। আমাদের সে পথ উত্তরাভিমুখী।

প্রায় তিরিশ ব্লক গেছি দুর্ঘটনাস্থল থেকে, সেখানে নতুন তৈরি হয়েছে একটি সার্ভিস স্টেশান। আমার মনে একটা প্ল্যান দেখা দিল।

—কমরেড, এখুনি গাড়ি থামান, আমি আদেশ করলাম. পুলিস-কার তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষলো।

গ্যারেজের পেছনে অন্ধকার গলিতে যেখানে কার পারকিং হয় সেদিকে টর্চলাইট জ্বেলে আমরা এগিয়ে গেলাম, সেখানে আমরা একটি জখমী গাড়ি পেলাম যার উইণ্ডশীল্ড ভাঙা এবং হুড কিঞ্চিৎ তোবড়ানো।

শুধুমাত্র হঠাৎ আমার মানসিক এক খেয়ালে, বরাত জোরেই দারুণ এক আবিষ্কার করা সম্ভবপর হল।

তিন স্টেপ আগে আমার মনে হল দুর্ঘটনাকারীর গাড়িটাই পেয়ে গেলাম। রেডিয়েটার তখনো গরম, হুডের সামনেটায় আরকেডির ফ্ল্যানেল স্যুটের একটা ক্ষুদ্র অংশ লেগে আছে দেখা গেল।

আমি টর্চলাইটের আলো গাড়ির চতুর্দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে এমন এক দৃশ্যের সন্ধান পেলাম, যাতে ভয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। উইণ্ডশীল্ডের চূর্ণবিচূর্ণ কাঁচের মাঝখানে প্রায় দশ সেন্টিমিটার আকারের এক টুকরো মাথার খুলির হাড় গেঁথে আছে দেখলাম।

আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে আরকেডির তালুর সেই টুকরো হাড়টা বের করে এনে রুমালে জড়িয়ে পকেটে রাখলাম। পুলিসরা নিকটবর্তী থানায় এই প্রাপ্তির কথা জানিয়ে এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে পাঠাতে বললে, যে এসে এই গাড়িটাকে পরীক্ষাও করবে হাসপাতালকে আমরা জানিয়ে দিলাম যে আমরা অপারেশন রুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি।

তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠ সাইরেনের আওয়াজে আশেপাশের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমরা গর্কী হাসপাতালের দিকে এগিয়ে গেলাম দ্রুতগতিতে।

আমাদের আর্জেণ্ট কল পেয়ে ডাক্তাররা বিরক্তই হলেন বলা যায়। তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না যে একজন মুমূর্ষু রোগীর অপারেশন স্থগিত রাখবার উদ্ভট অনুরোধ কেন আমরা করলাম।

আরকেডি আমার ঘনিষ্ট বন্ধুদের অন্যতম, আমি ব্যাখ্যা করে তাদের বললাম, ওঁর জীবন বাঁচাবার জন্য অপারেশন করবার পূর্বে আমি চাইছিলাম এ ব্যাপারটা আগে আপনারা একটু দেখেন।

ডাক্তাররা প্রথমটা এমনভাবে আমার পানে তাকালেন যেন আমার মাথার ঠিক নেই। পরে একজন অকস্মাৎ রুমাল থেকে হাড়ের টুকরোটা ঝট করে তুলে নিয়ে বললেন, হাঁা হ্যাঁ হবে, এতেই

হবে। তাঁরা এরপর হাড়টাকে খুব ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত করে নিলেন। পরে অপারেশন টেবিলে শায়িত অচৈতন্য আরকেডি গুরেলেভিচ-এর তালুর ফাঁকা স্থানে সেই হাড়টা স্থাপন করে দিলেন। অপারেশান চললো প্রায় তিনঘণ্টারও বেশী সময় ধরে।

অবশেষে একজন চিকিৎসক বেরিয়ে এসে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম সেখানে এলেন।

—কমিশনার, তিনি বললেন, আপনার বন্ধু এখন বিপদমুক্ত। ভ্যাগ্যিস হাড়ের ঐ ভাঙা টুকরোটা পেয়েছিলেন, নয়ত ওর জীবনের আশা আদৌ ছিল না।

দশ মিনিট বাদে অপর একটি পুলিসকার এসে খবর দিল যে দুর্ঘটনাকারী লোকটাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির নম্বর প্লেট-এর সূত্র ধরে।

তার বাড়িতেই গ্রেপ্তার হয়েছে সে। মত্ত অবস্থা ছিল তার। সে সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ স্বীকার করেছে। যদিও সে ছিল পার্টির একজন উঁচু দরের অফিসিয়াল, তবু তাকে তার এই অপরাধমূলক অবহেলার জন্য ভালভাবেই গুণাগার দিতে হল।

ওই একটি মাত্রই কেস, যেখানে শেষ হল দ্রুত, সনাক্তকরণও হল দ্রুত আর সবার ওপরে পরম ভাগ্যের মাধ্যমে একটি লোকের প্রাণ বেঁচে গেল।

বাইরের অপরাপর দেশ, রাশিয়ার পুলিসদের এই বলে দোষা-রোপ করে যে তারা নাকি শুধুমাত্র অপরাধী গ্রেপ্তারেই সমধিক উৎসাহী আর সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুবধেই তারা করিতকর্মা।

কিন্তু আমি বিশ্বজোড়া আমার পুলিস সহকর্মীদের জানাতে চাই যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোন তফাতই নেই।

আমরা একটি জীবন বিনষ্টের চেয়ে হাজার গুণে পছন্দ করি তাকে রক্ষা করবার, প্রাণে বাঁচাবার।

ভ্রাম্যমাণ সার্কাস ও মর্মান্তিক মৃত্যু
(ভ্যাঙ্কুভার ক্যানাডা)

পুলিসচীফ মাইক পিয়ার বললেন ঃ

প্রত্যেকেই সার্কাস ও মেলা প্রদর্শনী ভালবাসে। কিন্তু ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার অন্তর্গত কুয়েসনেল নামক ক্ষুদ্র শহরে এবং আশেপাশের মানুষ এ ধরনের ভ্রামামাণ কোন দল এলে যেন পাগল হয়ে যায়। কারণ হল, এই শহরটি ক্যানাডার এক পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে অবস্থিত।

বছরে অধিকাংশ সময় দুরতিক্রম্য তুষার-বরফে ঐ স্থান দেশের বাদবাকী অংশ থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন এদের আমোদ-আহ্লাদ বলে কোন বস্তু থাকে না। নিজেরাই নানা প্রকার আমোদোপকরণ আবিষ্কার করে নিয়ে বন্দী দশার ক'মাস কালাতিপাত করে।

সেবার যেই লাল নীল সবুজ রঙের পোস্টারে এক সার্কাস ও মেলার আগমন সংবাদ ছেয়ে গেল অমনি সে অঞ্চলের আপামর জন-সাধারণ চরম উল্লাসে যেন কিলবিলিয়ে উঠল।

ছেলেমেয়েরা তাদের জমানো এক বছরের টয়-ব্যাঙ্ক খুলে পয়সাকড়ি গুনতে বসল। যুবকরা এই সার্কাসের সৌজন্যে প্রেমিকাদের সঙ্গে সেখানে মিলিত হবার সুযোগের কথা ভেবে ডগমগ হয়ে গেল। এমন কি বয়স্ক মানুষেরাও সার্কাস আগমন সংবাদে উল্লসিত হল সন্দেহ নেই। এবার মেলায় যাবার জন্য নতুন নতুন হ্যাট ও টাই কেনবার একটা অজুহাত হল।

খুঁটি-তাঁবুর গাড়ি এসে পৌঁছতেই কুয়েসনেল শহরের জনসংখ্যা প্রায় ডবল হয়ে গেল। হাঁটা পথের দূরত্বের নরনারীরা লাইন ধরে শহরের পথ ধরল। আরও দূরের মানুষ সব কেউ ঘোড়ায়, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে, কেউ জিপ, কেউ বড় ট্রাকভর্তি হয়ে শহরের দিকে

রওনা দিল। দূর দূরান্তরের দুর্গম স্থানের কিছু লোক মালবাহী প্লেনের পাইলটদের জপিয়ে উড়ে এসেও পড়তে লাগল ক্ষুদ্রকায় ঐ শহরে।

কুয়েসনেল-এর পথঘাট নতুন নতুন মুখে ভরে গেল। চাষী, বণিক, চাকুরে কেউ বাদ রইল না। সদাপ্রফুল্ল জনতা থেকে গোমড়ামুখো রেড ইণ্ডিয়ান সবাই এসে পৌঁছল সার্কাসের আকর্ষণে।

এ শহরের ছেলেপুলেদের কাছে এ সার্কাস একাধারে রাজা-রাণীর রাজ্যাভিষেক, ফেয়ারিল্যাণ্ডে অভিযান এবং ক্রিসমাস-এর ত্রয়ী আনন্দের উত্তালতা বয়ে আনে।

ছোটদের মধ্যে ডোনালি করবেটই যেন বেশী উল্লসিত হল উত্তেজনায়। বরফ ঢাকা দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যাগুলি সে বই পড়ে কাটিয়েছে, সবই সার্কাস সংক্রান্ত বই। মনে মনে কল্পনায় সে বাঘের খেলা দেখিয়েছে, ট্রাপিজ-এর খেলা খেলেছে। ওর কানে সার্কাসের মনহরণকারী বাজনা অব্যক্তে সদা সর্বদাই বেজে চলত। শেষ দিকে সে বুঝি ঠেলে ঠেলে এক একটা দিনকে সরিয়ে দিয়েছে সেই শুভদিনটির জন্য যেদিন সত্যি সত্যিই শুভাগমন হবে আসল সার্কাসের।

করবেট পরিবার তীর্থস্থান স্বরূপ কুয়েসনেল শহরে এসে উপস্থিত হল বড় একটা বগি ঘোড়ার গাড়িতে করে। মেলার আস্তাবলে রেখে দিল ঘোড়াগুলিকে। ডোনালী ও তার সহচরী ওদের গৃহরক্ষক-এর মেয়ে স্মারন বোর্নেসকে দু-দু ডলার হাতে দিয়ে করবেট কর্তাগিন্নী পাঠিয়ে দিল সার্কাস প্রাঙ্গণে।

দুটি চঞ্চল কিশোরী প্রায় ছুটে চলে গেল স্বপ্নের আনন্দনগরী সার্কাস মেলায়। ডোনার বয়েস বারো কিন্তু তার দৈহিক পুষ্টিতার ও দৈর্ঘ্যের জন্য মনে হত আঠারো উনিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। অপর দিকে দুবছরের বড় স্মারনকে মনে হত ছোট তার ক্ষীণকায় দেহাকৃতির জন্য।

দুই সখী গিয়ে পড়ল হাজার মজা প্রাঙ্গণে। হইচই হুল্লোড় আনন্দ গান উল্লাসে ভরা মেলা। 'চলে আসুন চলে আসুন, পরের শো এক্ষুনি

শুরু হবে। দেখে যান অবিশ্বাস্য মোটা বিপুলাকার লেডি আঙ্গোপঙ্গোকে।' চিৎকার করছে এক প্রদর্শনীওয়ালা। বিচিত্র ও জিভে জল-আসা খাবারদাবারের গন্ধে প্রাণ মাতোয়ারা। পায়ের তলায় কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো পথ, চারদিকে আলোয় ঝলমল। কত সাতরঙা রঙেই না আলোর পসারী। সবকিছুই মনপাগল করা ব্যাপার-স্যাপার।

হাতে দুজনের দুটি দীর্ঘকায় লাল ও সাদা রঙের ক্যাণ্ডি, দুজনে এসে উপস্থিত হল একটা মঞ্চের সামনে যেখানে বসে আছে খুবই সুপুরুষ একজন যুবক। তার কোলে একটা কাঠের তৈরী ডামি······হুবহু তারই প্রতিমূর্তি, সেই বাদামী বড় বড় চোখ, সুন্দর হাসি হাসি মুখ।

পেছনের পোস্টারে লেখা : এডি, ও তার লিটল এডি, দুজনেই এসেছে প্রখ্যাত হলিউড থেকে। স্বনামখ্যাত ভেনট্রিলোকুইস্ট। উঃ ভাবা যায়! স্বয়ং হলিউড থেকে এসেছে এরা। তারপর দেখা গেল কাঠের ডামি লিটল এডি সরাসরি তাকাল ডোনার পানে এবং পরক্ষণে আশে পাশের জনতা শুনতে পায় এমন উচ্চস্বরে বলে উঠল : বাঃ তুমি বেশ সুন্দরী।

উপস্থিত জনতা হেসে উঠল। লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল ডোনা। পরে সামলে নিয়ে বয়স্ক যুবতীর ঢঙে বলে ওঠে : ধন্যবাদ আপনাকে।

আসল এডি ও লিটল এডি একসঙ্গে কথা বলতে লাগল, গল্প বলল, গান গাইল। খেলা শেষে সবাই চলে গেল কিন্তু ডোনা দুচোখ ভরে প্রণয় চাউনি নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। সত্যি সত্যিই এডি একজন চমৎকার রূপবান পুরুষ এতে কোন সন্দেহ নেই। ডোনা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল তার পানে। আসল এডি তখন একটু ঝুঁকে পড়ে ডোনাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, শো'র শেষে চল না আমার সঙ্গে কোন রেস্টুরেণ্টে বসে কিছু খাব।

ডোনা এ ব্যাপারে মনস্থির করে কিছু বলবার আগেই স্থারন তাকে ভ্রূ কুঁচকে অভিভাবকি ঢং-এ টেনে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

ওদের পরবর্তী অভিজ্ঞতাটা খুবই ভয়াবহ। একজন বুড়োর সঙ্গে কথা বলছিল ওরা। প্রথমে লোকটাকে মনে হয়েছিল ভাল কিন্তু যখন তারা ওর শো দেখতে রাজি হল তখন ওদের সন্দেহ দেখা দিল যে ঐ কুতকুতে চঞ্চল চাউনী বা শনের মত শাদা চুল প্রকৃতপক্ষেই 'কারুর ঠাকুরদা' কিনা। লোকটা নিজেকে আংকল বার্নি নামে অভিহিত করল। সে একজন রোজা বা সাপুড়ে বলা যায়। তার গলা বাহু জড়িয়ে রয়েছে ছয়ফুট দীর্ঘ একটি বোয়া সাপ। সে অনায়াসে ভয়ংকর বিষাক্ত র‍্যাটল সাপকে মাথা ধরে তুলে তার মুখ হাঁ করিয়ে কালান্তক ভয়ংকর বিষদাঁত প্রদর্শন করাচ্ছে। তাঁর তাঁবু ভর্তি সাপে সাপ। লোকটার দৃষ্টিতে দয়ামায়ার চিহ্নমাত্র নেই, তার চাউনিও সাপগুলির মতই গা ছম ছম করা হিংস্রতায় ভরা। সে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বলে যাচ্ছিল কি ভাবে একটি মাত্র ছোবলে কিং কোবরা মুহূর্তে খতম করে দেয় মানুষ, কি ভাবে বোয়া পাইথন একবার জড়িয়ে মানুষের হাড়গোড় নিমেষে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে। দুটি মেয়ের কাছে আংকল বার্নি একজন দানব রূপেই প্রতিভাত হল। ওরা দুজন তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাবাঃ, বাঁচা গেল ঐ বিষাক্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে!

এরপর এল সেই রেড ইণ্ডিয়ানটা। সে লোকটা সাংঘাতিক মদ খেয়ে এক সময় টলতে টলতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ভয় পেয়ে ওরা ত্রস্তে একটা ছোট 'শো' দেখতে ঢুকে গেল এক তাঁবুতে।

সেটা কুকুর খেলার প্রদর্শনী। মাঝখানের রিং-এ কতগুলো কুকুর ও তার ট্রেনার দাঁড়িয়ে। কুকুরগুলি দেখা গেল সাংঘাতিক বুদ্ধি ধরে। আদেশ মাত্র অদ্ভুত পোজ-এ বল ধরে, মড়ার মত শুয়ে থাকে, দুই আর দুই-এর যোগ করে দিল একটা কুকুর। ট্রেনার মিঃ কিংকহেড এবার ডাকলো তার স্ত্রীকে। ভদ্রমহিলা টাইট পোষাকে ছোট একটা টাট্টু ঘোড়া চেপে এসে উপস্থিত হল। সেও নানারকম মজার মজার খেলা দেখাল। ঐ ভয়াল সাপুড়ের অভিজ্ঞতার পর এই সুন্দর শো

দেখে ওদের মনটা যেন হাল্কা হয়ে গেল।

সময় স্রোতের মত কেটে যেতে লাগল. আরও কত জিনিস দেখবার বাকি। সুস্বাদু একটা হট ডগ এবং এক গ্লাস আঙুরের শরবত খেয়ে দেখলো পয়সা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওরা যেখানে বসে খাচ্ছিল তার দুটো টুল তফাতে বসেছিল সতের বছর বয়সের স্বর্ণকেশ একটি তরুণ। দেখে মনে হল সে ওদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে যেন উসখুস করছে, সে একবার অনেকক্ষণ ধরে ডোনালীর পানে তাকিয়ে রইল, তারপর সহসা উঠে এসে ওদের পাশের টুলে বসে পড়ে খানিকটা সংকোচ সহকারেই শুরু করল ঃ

—আপনাকে আমি গতবারও দেখেছি। আমি এ শহরেরই ছেলে, আমার নাম পল জোহানসন। আমার সঙ্গে যে কোন একটা শো দেখবেন কি ! কিংবা একটা হটডগ বা সামথান খাওয়া······ বা···

ডোনা হাসল। আজকের রাত অ্যাডভেঞ্চারেরই রাত। কিন্তু অপরিচিত কারুর সঙ্গে ঘোরাফেরা তার বাবা-মা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

ধন্যবাদ—ডোনা বললে, উপযুক্তভাবে পরিচিত না হলে আমি কোন ছেলের সঙ্গে যাই না, এই বলে সে স্যারনকে নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করল।

আলো ঝলমল আনন্দ উজ্জ্বল পরিবেশে ওরা হেঁটে চলল। কলরব, প্রাইজ, অসম্ভব কাণ্ডকারখানা, অবিশ্বাস্য এবং রোমান্টিক পরিবেশ এ মেলা প্রাঙ্গণের। সামান্য পয়সায় কত না মজা।

ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল ওরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে শুটিং গ্যালারীর কাছে। শুটিং পরিচালনা করছে করকি ভিনসেণ্ট নামক নীল নয়ন ও রূপবান এক যুবক। এলোমেলো চুল এসে কপালে পড়েছে, ভিনসেণ্ট মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চুলগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছিল। করকি খুব গভীর আলোচনায় মত্ত ছিল দুজন লোকের সঙ্গে।

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল উনিশ বছরের কিশোর পল। সে এসে কাউন্টারে একটা ডলার বিল জমা দিয়ে বন্দুকটা তুলে নিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পাঁচ, পাঁচটা গুলি করে হলদে হাঁসটাকে স্থানচ্যুত করে মরদের মত ভঙ্গীতে বন্দুক রেখে মেলার ভীড়ে মিশে গেল।

—খুব ভাল গুলি চালায়, করকি একটা মেয়েকে প্রশ্ন করে, আপনাদের বন্ধু নাকি?

স্যারন মাথা নাড়ল, কিন্তু ডোনা কিছুটা রোমান্টিক ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে বলে উঠল, মানে···হ্যাঁ···প্রায় তাই।

এবার করকি মেয়ে দুটিকে শেখাতে লাগল কি ভাবে বন্দুক ধরতে হয়, নিশানা করতে হয়, গুলি চালাতে হয়। সে তার সহচর দুজনের সঙ্গে মেয়ে দুটির পরিচয় করিয়েও দিল। তাদের একজন খুব বিশিষ্ট মানুষ, সে হল সার্কাস ম্যানেজার বার্ট রেনল্ডস, অপরজন হল সার্কাস প্রাণীদের ট্রেনার রেড ব্লেডসো। পশুদের ট্রেন করা, তাদের খাঁচা পরিষ্কার করা এবং তাদের খাদ্য পরিবেশন করাও তার কাজ।

করকি মেয়ে দুটির সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছিল। রাত বেড়ে চলবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ও ভাঁটা দেখা দিল। কিন্তু মেয়ে দুটি যতক্ষণ না তাদের পয়সাকড়ি একেবারে খতম হয়ে যায়, বেশ অধিক রাত পর্যন্ত তারা শুটিং করা শিখে যাচ্ছিল।

অবশেষে প্রায় নিস্তব্ধতা নেমে এল মেলা প্রাঙ্গণে। মজা সেদিনের মত ফুরিয়ে যাওয়ায় ওরা দুজনই প্রায় মুষড়ে পড়ল।

—কাল আসছেন তো আপনারা, করকি জিগ্যেস করে, নিশ্চয়ই আসবেন।

—আমরা ঠিক বলতে পারছি না, ডোনা জবাব দিল, আজ রাতেই আমাদের পয়সা ফুঁকে দিয়েছি, অবশ্য মজাও পেয়েছি খুবই। আশাকরি বাবা আমাদের আরও কিছু পয়সা দেবেন।

—আমার একটা আইডিয়া আছে, ওদের নতুন বন্ধু বলে ওঠে মেলার এটা হল শেষ প্রান্ত। সবাই আসে, সার্কাস দেখে, ওরই

কাছাকাছি আমোদ-আহ্লাদ করে ফিরে যায়। এতদূর আর বড় একটা কেউ আসে না। আপনারা যদি দুজনে এখানে পপ-কর্ন এবং কটন ক্যাণ্ডি বিক্রি করেন, বন্ধুবান্ধবদের শুটিং করতে আনেন, এবং এখানে লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকেন, তাহলে আমার পক্ষে খুবই সুবিধে হয়। পরিবর্তে প্রত্যেকটি শোয়ের জন্য আমি আপনাদের পাস-এর জোগাড় করে দেব।

আরেকটি আজব ঘটনা, অপূর্ব সুযোগ। এই বিস্ময়কর মেলা, শহরের একজন বনে যাওয়া, সার্কাসে চাকরী হওয়া। কি মজা! তৎক্ষণাৎ দুটি কিশোরী এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। আনন্দে ডগমগ, কপর্দক-শূন্য দুটি মেয়ে দৌড়ে চলে গেল মিঃ ও মিসেস করবেটকে এ সুসংবাদ দিতে।

মিসেস করবেটের এ প্রস্তাব আদৌ পছন্দ হল না, তবু মেয়েদের পরম উৎসাহ দেখে নিম রাজি হলেন। মিস্টারও রাজি হয়ে গেলেন। এক হলেও বাচ্চা বয়েস, নরকও নয় একটু একটা আনন্দ।

পরদিন শনিবার সন্ধ্যায় বাবা মা, ডোনা ও অ্যানকে মেলায় পাঠালেন। হুঁশিয়ার করে দিলেন তারা যেন মনে রাখে তারা এখন কিশোরী মেয়ে, শিশু নয়। স্থির হলো রাত দশটায় বাবা মা ও মেয়েরা মিলিত হবে ড্রাগ স্টোর-এ।

সেই বাবা-মায়ের শেষ দেখা তাদের আদরের কন্যা ডোনার সঙ্গে।

* * * *

ঘটনা যখন এই পর্যায়ে তখনই আমার আসতে হল। আমার জন্মস্থান কুয়েসনেল শহরে। আমার মা তখন ওখানেই বাস করতেন, আমি চাকুরী করতাম ভ্যাঙ্কুবার-এ।

ভ্যাঙ্কুবারের হেডকোয়ার্টারেই এসে ধন্না দিল বেশ কিছু কুয়েসনেল-এর মানুষ। তাদের মধ্যে শিকারী, চাষী এবং অপরাপর যাবতীয় উপজীবিকার মানুষ। তারা কুয়েসনেল-এর পুলিস অফিসার কনস্টেবল উইলিয়াম জি পুলারের কাছ থেকে এক অনুরোধপত্র নিয়ে এসেছে

আমি যেন নিরুদিষ্ট কিশোরীর কেসটা গ্রহণ করি। নিজের হোম-টাউন, দুর্বলতা স্বাভাবিক। চলে এলাম।

প্রথমেই পুলিস রিপোর্ট দেখে শোকমগ্ন করবেট পরিবার এবং কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফোলানো সহচরী স্যারনের মুখোমুখি হলাম।

মিঃ করবেট জানাল, আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা মত স্যারন এসে নির্দিষ্ট ড্রাগ স্টোরে দেখা করে কিন্তু ওর সঙ্গে ডোনালী ছিল না।

—হ্যাঁ তাই, ক্রন্দনরতা স্যারন সায় দিয়ে বলে, বেলা পাঁচটা থেকেই ডোনাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। মিঃ করকির হয়ে আমরা কটন ক্যাণ্ডি বিক্রি করছিলাম। মিঃ করকি বললেন প্রাইজের জন্য তার কিছু সিগারেট চাই, তাই তিনি ডোনাকে শহরের অয়েস্টার বার-এ পাঠালেন সেগুলো আনবার জন্যে।

তিনি ওকে পাঁচ ডলার দিয়ে বললেন বাদবাকী খুচরো তার চাই না, সেটা ডোনাই যেন রেখে দেয়। ওর দেরী হচ্ছে দেখে ভাবলাম পথে হয়ত কোন শো দেখতে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু যখন দশটা বেজে গেল আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

—তারপর কি হল বল, আমি প্রশ্ন করি।

—ডোনা কুয়েসনেলের রাস্তাঘাট চেনে। সে হারিয়ে যেতে পারে না, মিঃ করবেট এবার বললেন, আমরা তখন গাড়ী নিয়ে সার্কাসে গেলাম। অনেক রাত তখন, তাঁবু বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ওখানে কোথাও পাওয়া গেল না ডোনাকে। ভাবলাম যে মেয়ে সার্কাস-পাগল, হয়ত কোন মতলববাজের পাল্লায় পড়ে কোথাও গেছে। কিন্তু ওখানকার কেউ কিছু বলতে পারল না।

পরদিন কনস্টেবল পুলার ও আমি গিয়ে সার্কাস কর্তৃপক্ষকে ধরে নানা কথা বিশেষ করে ভিনসেন্টের বিষয়ে প্রশ্নাদি করি। করকি শপথ করে বলে সে ডোনাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছিল, ডোনা ফিরে এসে সিগারেট দেয়, সে নাকি ওকে ষাট সেণ্ট খুচরো টিপস্ স্বরূপ দেয়।

আমরা সার্কাসের সব খেলোয়াড়দের জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু আমার ছোট্ট মেয়ের সংবাদ কেউই দিতে পারল না।

বলতে বলতে মিঃ করবেটের চোখে জল এসে গেল।

কনস্টেবল পুলার বললে, সে নাকি শহরের অয়েস্টার বার-এ তদন্ত করেছে। মালিক জোকি চাউর স্মরণ আছে ডোনাকে সে সিগারেট বিক্রি করেছিল। স্মরণ ছিল এইজন্যে যে এতটুকু এক কিশোরী এ ধরনের সিগারেট কিনতে এসেছিল বলেই, আর কিছু সে জানে না।

শনিবার হারিয়েছে মেয়েটা, আজ সোমবার। সার্কাস পার্টি ইতিমধ্যে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও রওনা দিয়েছে। ভাবলাম পথে ওদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেমন হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যে ঐ সমস্ত দলটিকে পথে রোখা যায়। তবু আমরা দুজন ডেপুটিকে পাঠালাম ঐ কেরাভেনের সঙ্গে, টুকরো আলাপে যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া গেল না কিছু।

এসব ক্ষেত্রে যা মনে হয় তাই ভাবলাম অর্থাৎ মেয়েটি বোধকরি আর প্রাণে বেঁচে নেই। এইটেই আশংকা। তবে কোন প্রমাণও হাতে নেই। এ দেশটা বিরাট এক জনমানবশূন্য নির্জন প্রান্তর, গরু ঘোড়া আর কিছু শিকারীদের দেখা যায় মাত্র ধু ধু প্রান্তরে। এখা যে কোন মৃতদেহ অনায়াসে চিরকালের মত বিলীন করে রাখা সম্ভব। কোথায় যাব মৃতদেহ খুঁজতে!

আমি ভ্যাঙ্কুবার থেকে ট্রেইণ্ড ব্লাডহাউণ্ড আনাবার জন্য নির্দেশ দিলাম। যদিও আমার সন্দেহ ছিল এত বিরাট অঞ্চলে জঙ্গল অধ্যুষিত মাইলের পর মাইল স্থানে তারা কতদূর অপরাধী বা শবসন্ধানে সমর্থ হবে। তবু দেখা যাক। শহরের নানা লোককে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সেই উনিশ বছরের পল জোহানসনকে ধরে প্রশ্ন করলাম। সে অন্য এক কাহিনী বলল :

এটা ঐ রেডইণ্ডিয়ান স্কাউট লংফুটের কাজ হতে পারে। সে

মত্তমাতাল হয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করেছিল। আপনারা ওকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। একটা জিনিষে আমার খুবই খটকা লাগছিল। পল বড় বেশী উৎসাহে আমাদের সাহায্য করতে চাইছে। আর ছেলেটা ভাল গুলি চালাতে পারে। আমি উৎসাহ দিয়ে বলি, খুব ভালভাবে চিন্তা করে দেখ পল ঠিক শেষ কখন তুমি ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেছিলে?

পাঁচটার পরে।

—সেটা প্রথমেই আমাদের বলনি কেন? জান আমরা খবরাখবর অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

- আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি।

এবার সন্দেহ পড়ল লংফুটের ওপর, তিনজন লোক তাকে মেয়েটি নিরুদ্দিষ্ট হবার রাতে সার্কাস এলাকায় দেখেছে। একজন বললে ওর শার্টে রক্তের দাগ ছিল; আমি ভাবলাম ও বোধ হয় কারুর সঙ্গে মারপিট করে থাকবে। ইতিপূর্বেও সে বহুবার চূড়ান্ত মাতাল হয়ে মারদাঙ্গা করেছে।

আমি এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিলাম না। রেড ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের মতই মদ খেয়ে শান্তি ভঙ্গ করলেও তারা খুব কমই নরহত্যাকারী বা ধর্ষণকারী হয়ে থাকে। তারা অধিকাংশই আইন-মোতাবেক জীবনযাপন করে থাকে। তবে লংফুট হয়ত ব্যতিক্রম হতে পারে।

ইণ্ডিয়ান রিজারভেসনের উচ্চতায় লংফুটের কেবিনে পৌঁছতে দারুণ বেগ পেতে হল আমায়। ঘোড়ার ট্রেলার গাড়ীতে গেলাম যতদূর রাস্তা পাওয়া গেল। বাদবাকী পায়ে চলা পথ।

এগার ঘণ্টা বাদে গিয়ে পৌঁছেছিলাম তার শূন্য কেবিনে। ঠাণ্ডা নেভানো স্টোভ ও ধুলো জমার পরিমাণ দেখে মনে হল সে বেশ কিছুকাল এখানে আসেনি। এর পর এক নতুন পন্থা ভাবলাম

লংফুটকে ঠ্যালায় ফেলে আমাদের কাছেই আনতে হবে।

শীত আরম্ভ হয়েছে এখানে। রাত্রিকাল ভয়াবহ তুষারে-ঠাণ্ডায় জর্জরিত। পুকুরগুলো পাতলা বরফে আবৃত হয়ে যাচ্ছে। শীঘ্রই পাহাড়ের চূড়া তুষারে ছেয়ে যাবে। আমরা যদি ওর কেবিন থেকে যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে চলে যাই, সে বাধ্য হয়ে খাদ্যের সন্ধানে শহরে নেমে আসতে বাধ্য হবে। পরিকল্পনাটা আমার রুচিসম্মত না হলেও বাধ্য হলাম এটা করতে।

আমি শহরে ফিরে এসে একটি নোট পেলাম ঃ

গরুপালক অ্যাটন আণ্ডারসন শনিবার সার্কাসে এসেছিল। রবিবার থমসন র‍্যাঞ্চের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ভাঙ্কুবার চলে গিয়েছে।

সত্যমিথ্যা ঈশ্বর জানেন। হয়ত আমাদের দৃষ্টি আসল খুনীর দিক থেকে সরিয়ে নেবার এও এক চতুর পরিকল্পনা। তবু কোন সূত্রই অবহেলা করব না।

পরদিন সকালে আমি ও পুলার গাড়ী করে রওনা হয়ে গেলাম থমসন র‍্যাঞ্চে। মিঃ থমসন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মোটাসোটা এক ব্যক্তি। সে বললে, আমি বলতে পারব না কেন আণ্ডারসন চাকুরী ছেড়ে চলে গেল। নিশ্চিত ছিলাম যে সে শীতকালটা আমার এখানে অবশ্যই কাটাবে। আমি সব গরুপালকদেরই বরখাস্ত করেছিলাম। শুধু ওকেই রেখেছিলাম কেননা ও খুবই কমপিটেন্ট। মেয়েটি নিরুদ্দেশ হবার একই সময়ে আণ্ডারসনও কেটে গেল আমি সংবাদটা আপনাদের জানানো উচিত বলেই জানিয়ে ছিলাম।

আণ্ডারসনের ঘর তল্লাসী করে একটা ড্রয়ারের মধ্যে রক্তমাখা সার্ট পেলাম। ব্যাপারটা কি? ওটাকে ড্রয়ারে রাখবার মানে কি! ধুয়ে ফেলল না কেন, বা পুড়িয়ে ফেলতে পারত। আর যদি খুনী হয়ে থাকে তো সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সার্টটাকে ভাঙ্কুবারে পাঠিয়ে দিলাম ল্যাবরেটরী টেস্ট-এর জন্য।

আণ্ডারসন কোন ঠিকানা রেখে যায় নি। স্টেশানে তদন্ত করে

জানলাম সে ভাঙ্কুবার চলে গেছে টিকিট কেটে। খুবই শম্বুক গতিতে তদন্তকার্য চলতে লাগল। মেয়েটার সম্বন্ধেও আর কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলাম না। পল ছোঁড়াটাও সহসা ভাঙ্কুবার চলে গেছে বলে সংবাদ পেলাম। চিন্তিত হলাম খুবই। ছোঁড়াটা নাকি তার বাবা-মাকেও জানিয়ে যায়নি তার রাজধানীতে যাত্রার কথা।

এবার ভাঙ্কুবার ল্যাবরেটরী থেকে একটি টেলিগ্রাম এল: আণ্ডারসনের জামায় পাওয়া রক্তের দাগ মানুষের বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

আণ্ডারসন, পল ও লংফুট, এই তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির খোঁজ করতে থাকলাম। এদের চেহারার বর্ণনা দিয়ে নোটিশ পাঠানো হল বন্দর, রেল, রোড ও বাস লাইনে। কোন সূত্র বা সংবাদ পাওয়া গেল না।

এবার ট্রেইণ্ড কুকুর নিয়ে মৃতদেহ প্রাপ্তির আশায় জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। দ্রুত কাজ করতে হবে। প্রথম তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। এরপর ঐসব পাহাড় জঙ্গল এলাকা দুর্গম হয়ে উঠবে। শীত শেষে বসন্তে শবের আর চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অবশেষে প্রথম আলোকপাত দৃষ্ট হল। একজন ক্রিক নামক শিকারী বনেজঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে পাতা চাপা ডোনালীর মৃতদেহে হোচট খায়। শহর থেকে স্থানটির দূরত্ব প্রায় তিন মাইল।

মেয়ের বাপ-মাকে না জানিয়ে আগে আমরা সনাক্তকার্য সমাপন করলাম! করোনার জানাল মেয়েটাকে জুতোর ফিতে দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। ফিতে চামড়া কেটে মাংসের মধ্যে ঢুকে গেছে। বাধা দিয়েছিল বোঝা যায়, কেননা নিহত বালিকার মুখে হাতে বাহুতে নুনছাল জাতীয় প্রচুর দাগ দৃষ্ট হল। কিন্তু মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় সেখানকার গাছপালা ঘাস এতটুকুও বিপর্যস্ত হয়নি। বোঝা গেল হত্যা করা হয়েছে অন্যত্র। ডোনার ব্যাগে টিপস পাওয়া যাট সেণ্ট তখনও রয়েছে দেখা গেল।

অফিসে এসে ভাবতে গিয়ে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। এক, কেউ হয়ত কিশোরীটিকে সার্কাসের চেয়েও বড় প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে অন্যত্র ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে, কেননা ওর পকেটে পয়সা ছিল, সেগুলো মেলায় ফুঁকে দেওয়ার আনন্দের চেয়েও বড় কোন আকর্ষণ ওর সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়টি হতে পারে যে, ডোনাকে আগে হত্যা করে তবে ঐ জনমানবহীন দূর প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবহন স্বরূপ কোনো না কোনো গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে।

ছজন মিলে মৃতদেহ প্রাপ্তির স্থান তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলাম। চার ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর গুরুত্বপুর্ণ একটি ব্যাপার আমরা খুঁজে পেলাম। কিছুদূরে রাস্তার পাশে গাড়ির একটি টায়ারের দাগ দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টারকাস্ট করে নেওয়া হল টায়ার চিহ্নের।

অবশ্য এর দ্বারা কতদূর কি হবে তা বলা মুশকিল। কেননা এ ধরনের হাজার হাজার টায়ার রয়েছে বিভিন্ন গাড়িতে। কাকে ছেড়ে কাকে ধরব।

আমি পুলারকে বললাম যে, আমি এবার ঐ ভ্রাম্যমান সার্কাসের প্লেয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওদের প্রতি সন্দেহ আমার যায় নি এখনো।

—কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানের কি হল? পুলার বললে, ওর এই বেপাত্তা থাকাটা আমার আদৌ ভাল লাগছে না। ওকেই সন্দেহ হয় আমার।

—না, আমার তা হয় না, আমি বলি, ডোনা যদি ওর সঙ্গে যেত তাহলে ওর হাতের ষাট সেণ্ট প্রথমেই খরচা করে যেত। কিন্তু ওর কাছে ঐ খুচরোগুলো থাকায় মনে হচ্ছে এমন কারুর সঙ্গে সে গিয়েছিল যার সঙ্গে যাওয়ায় ওর নিজের কোন পয়সা খরচার প্রয়োজনই হয় নি। কোন সার্কাসের কেউও হতে পারে। কিংবা ঐ গরুপালক বা সেই উনিশ বছরের ছেলেটা। তবে রেড ইণ্ডিয়ান যে নয় এ বিষয়ে আমি ধ্রুব নিশ্চিত।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই সহসা দরজা ঠেলে উপস্থিত হল নিরুদ্দিষ্ট পল।

—কি ব্যাপার পল, কোথায় ছিলে এতদিন? পুলিস তোমাকে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার যাবতীয় স্থানে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার বাবা-মা-ও চিন্তায় পাগল। উত্তরে পল জানায় সে বাবা-মাকে চিন্তায় ফেলতে চায় নি। মিনিমাগনা ভ্যাঙ্কুবার যাতায়াতের একটা সুযোগ পাওয়ায় সাত তাড়াতাড়ি সে চলে যায়। যাবার আগে বাবার দোকানে ফোন করে লাইন পায়নি। মাকে একটা পত্র লিখে গেছিল কিন্তু সে পত্রটা খাটের ফাঁকে পড়ে যাওয়ায় সে তা পায়নি। যাই হোক সে আর এমন ভাবে চিন্তায় ফেলে কখনো যাবে না।

ওর কথা আমাদের অবিশ্বাস হল না।

পুলার ও আমি অফিস ছেড়ে টিকিট কাটতে গেলাম। চলমান পার্টিকে ওরা প্রিন্সরুপার্টে পৌছবার পূর্বেই ধরতে চাই।

সার্কাস দলে পৌছে প্রথমেই করকি ভিনসেণ্টকে ডেকে প্রশ্নাদি শুরু করলাম।—তোমার শুটিং মঞ্চ থেকে চলে যাবার পর ডোনা কোথায় গিয়েছিল?

—আমি এ প্রশ্নের জবাব এর আগেও দিয়েছি অফিসার। তার ইতস্ততভাব দেখে মনে হল কিছু একটা গোপন করবার চেষ্টা করছে সে।

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠি, এটা একটা মার্ডার কেস ভিনসেণ্ট। কোন সংবাদ গোপন করা কিন্তু সাংঘাতিক অপরাধ। যা জান বলে ফেল। কে ছিল ডোনার সঙ্গে?

ধমকে ভয় পেয়ে ভিনসেণ্ট বললে, আমি কাউকে বিপদের মধ্যে ফেলতে চাই না। বিশেষ করে আমি যখন সঠিক নিশ্চিত নই।

—ঠিক আছে। যা জান সব খুলে বল। যদি আইনভঙ্গ না করে তো কারুরই বিপদ হবে না।

—বেশ বলছি। সিগারেট কিনতে যাবার আগে আমি ডোনাকে

রেড-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। রেড সেখানে বহুক্ষণ ধরেই ঘোরাঘুরি করছিল। আমি ওদের দুজনকে এক সঙ্গে যেতে অবশ্য দেখি নি। তবে হয়ত······

—এই রেডটি কে?

পুলার বললে, রেড ব্লেডসো হল সার্কাসের পশুদের খাবার খাওয়ায়, খাঁচা পরিষ্কার করে। ডোনা এবং স্যারন ভিনসেণ্টের কাছে থাকায় ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

রেডকে ডেকে আনা হল। একটি অতি গেঁতো ধরণের যুবক সে। কথা বলে আস্তে, চলে আস্তে, হয়ত বা চিন্তাধারাও তার আস্তে হয়।

—মেয়েটার সঙ্গে আমার কোন ডেট হয় নি, সে বলে গেল, করকি যখন ওদের সঙ্গে কথা বলছিল সেই তখনই আমি প্রথম দেখেছিলাম ওদের দুজনকে শুটিং গ্যালারীর সামনে।

—পাঁচটার পর কোথায় ছিলাম আমি, জিজ্ঞেস করছেন? শুনুন মিস্টার, আমি তখন মেইন টেণ্টে ঘোড়াদের খাওয়াচ্ছিলাম। সন্ধ্যে সাতটার শোর আগে ওদের আমায় দেখা শোনা করতে হয়!

কোন দিকেই কোন সুবিধে হল না। যদি সার্কাস-এর লোকেরা জানেও কে মার্ডার করেছে তাহলেও তারা খুনীর পরিচয় চেপে তাকে রক্ষে করবে। কিংবা এমনও হতে পারে বাস্তবিক পক্ষেই ওরা জানেনা খুনী কে বা কারা।

এবারে টায়ারের ছাপের সঙ্গে সার্কাসের যাবতীয় গাড়ির টায়ার মেলাতে লাগলাম। মিলল না। কেননা এদের গাড়ি বড় সাইজের। টায়ারও মোটা। অবশেষে পার্কিং লটের শেষ প্রান্তে একটা স্টেশন ওয়াগান পেলাম যার টায়ারের সঙ্গে আমাদের পাওয়া ছাপের মিল হল। ভেতরে রাবার সোল জুতোর পায়ের ছাপও পেলাম। টেনিস সু-র ছাপ। এই রকম জুতোই পরেছিল ডোনালী।

আমরা ডোনার জুতো চেয়ে পাঠালাম কোয়েসনেল শহরে। গাড়িগুলির মালিক হল মিঃ ও মিসেস কিংক হেডের, এরা কুকুর ও

টাট্টু ঘোড়ার খেলা দেখায়। এই স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম।

পুলার পুলিসি কণ্ঠে বললে, কোন কথা চাপবেন না, সব কিছু খুলে বলুন।

দুজনেই ভয় পেয়ে গেল, বলেন কি আপনারা! আমরা কিছুই করি নি। ঐ কিশোরী আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা।

—মিঃ কিং হেড আপনার গাড়ির সামনের টায়ারের ছাপ আমাদের পাওয়া ছাপের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আমি বললাম, এ সম্বন্ধে কি বলবার আছে আপনাদের?

—এর দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না, কিংক হেড বললে, এক ধরনের শত শত টায়ার রয়েছে দেশে। টায়ারের ছাপে কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না।

—তা ঠিক, আমি বললাম, টায়ারের ছাপ হয়ত কিছু প্রমাণ করে না কিন্তু আরেকটি ছাপ আমরা পেয়েছি সেটা হয়ত কিছু প্রমাণ করবে। আমরা মৃত কিশোরটির জুতোর ছাপ পেয়েছি অভ্যন্তরে। এবার কি বলবার আছে বলুন?

মিসেস ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মিস্টারের মুখ নিমেষে শাদা হয়ে গেল। মুখ নেড়ে কি বলবার চেষ্টা করল কিন্তু কোন আওয়াজ বেরুল না।—মাই গড, অবশেষে বাক্যস্ফূর্তি হল তার, আমি একথা বিশ্বাস করি না…আমি একথা বিশ্বাস করি না, তাহলে দেখান আমাকে। আমি দিব্বি করে বলছি আমি কিছু জানি না…

—আপনার খেলা কখন শেষ করেছিলেন?

বার্ট রেনল্ডস অর্থাৎ সার্কাস ম্যানেজার কিংক হেডের হয়ে বলে ওঠে, পাঁচটা পর্যন্ত ওরা খেলা দেখাতে ব্যস্ত ছিল।

—পাঁচটার পর আপনারা কি করেছিলেন?

—সেটা প্রায় দু-হপ্তা আগেকার ঘটনা। সঠিক বলা মুশকিল, তবে যতদূর স্মরণ আছে অভ্যেস মত আমি আমার তাঁবুতে ফিরে গিয়ে স্নান করে জামা-পোশাক পালটাই।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই, এতক্ষণ বাদে মিসেস প্রথম কথা বললেন, মনে আছে আমরা দুজনে একসঙ্গে গেছলাম।

এটা একটা হালকা অ্যালিবাই। মেয়েছেলে অবশ্য তার স্বামীর সাফাই গাইবেই।

—আমরা ভদ্রমানুষ, মিসেস বললে, আমরা পনের বছরের মেয়েকে খুন করে বেড়াই না। আমরা খুনী নয়।

অতঃপর যেন সহসা মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল এমনভাবে মিসেস কিংক হেড বলে উঠল, আমরা যে পাঁচটার পর থেকে দুজনেই আমাদের তাঁবুতে ছিলাম তার যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারি।

—সেই রাতেই আমরা আংকল বার্নিকে বার্থ-ডে পার্টি দিয়েছিলাম। নরম্যান, আশা করি তোমার মনে আছে ঘটনাটা?

মিস্টার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মনে আছে বৈকি। সবাই এসেছিল, বিগ এডি তার গাড়ি নিয়ে এল, এমন কি বিশাল মোটা জাটিও এসেছিল, যদিও সে বাইরে দাঁড়িয়েছিল. কেননা দরজা দিয়ে তার দেহ ভিতরে ঢুকছিল না। ওদের প্রত্যেককে জিগ্যেস করতে পারেন। সবারই মনে আছে সেই পার্টিটার কথা।

—কতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সেই পার্টিতে একসঙ্গে কাটিয়েছিলেন?

—সোয়া ছটায় ডিনারের ডাক আসা পর্যন্ত। আমরা একসঙ্গে আহার করে সাতটার শো-তে যোগ দিতে গিয়েছিলাম।

সবাই একই কথা বললে। আংকল বার্নির বার্থ সার্টিফিকেট দৃষ্টে প্রমাণিত হব যে জুলাইয়ের শেষ শনিবারেই তার জন্ম তারিখ পড়ে।

আবার আমরা অন্ধকার পাথরের দেওয়ালের সম্মুখীন হলাম। কিন্তু মেয়েটার যে জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে গাড়িতে তার কি হবে। ডোনার জুতোর মাপ বা ছাপ এখনো কুয়েসনেল থেকে এসে পৌঁছায়নি।

আমি ফের কিংক হেড-এর তাঁবুতে ফিরে এলাম।—দেখুন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি যে আপনারা স্টেশন ওয়াগনটা সে

রাতে ব্যবহার করেন নি। অন্য কেউ ব্যবহার করেছিল কি ?

—না। কক্ষনো নয়। আমি কক্ষনো গাড়ি লক না করে ছেড়ে আসি না।

—একথা সত্যি নয়, আমি প্রতিবাদ করে বললাম, আমরা আজ যখন গাড়িটা পরীক্ষা করি তখন তো ওটা লক করা ছিল না।

—মানে আমি বলতে চেয়েছি যে ইগনিশনের চাবি আমি সর্বদা বন্ধ করে রাখি। যে কোন লোকের গাড়ি স্টার্ট দিতে হলে ঐ চাবিটা চাই-ই। কোন সময়েই আমি গাড়ি বা চাবি হারাইনি।

—আপনাদের জন্তুদের খবর কি ? আমি কথা ঘোরাতে চেষ্টা করি, রেড কি তাদের খাওয়ায় ?

আমার চিন্তাধারা বোধ করি সে বুঝে ফেলল, হ্যাঁ, রেড আমাদের কুকুর ও টাট্টু ঘোড়াগুলির দেখাশোনা করে, তবে সে কখনো আমার গাড়ি ব্যবহার করে না।

বার্ট রেনল্ডস এতক্ষণ খুব নিস্পৃহ যেন স্বপ্নের রাজ্যে ছিল, সে সহসা বলে উঠল, আচ্ছা নরম্যান, ঐ বার্থডে পার্টিতে যেটা এসেছিল সেই বোতলটা রেড কোথা থেকে পেয়েছিল ? বা কি ভাবে এসেছিল ?

মুহূর্তখানেক ভেবে নিল নরম্যান, পরে বললে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই, আমি গাড়িটা দিয়েছিলাম বটে, তবে রেডকে না দিয়ে দিয়েছিলাম করকিকে। সে পার্টি শেষ হবার আগেই ফিরেছিল। এসে বলেছিল মদটা সে-ই কিনবে তাই গাড়ির চাবি আমার কাছ থেকে নিয়ে শহরে গিয়েছিল। সে চাবি এবং মদটা রেড-এর হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

নরম্যান এমন ভাব দেখাল যেন সে এক গুপ্তধন পেয়েছে।

আমার মনোভাবও একই রকম হল।

পুলার, ডেপুটিরা এবং আমি করকি ভিনসেণ্ট-এর তাঁবুতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করলাম।

—আপনি কি পাগল হয়েছেন ? ভিনসেণ্ট বলে ওঠে, তাছাড়া রেড-এর কাছে চাবি ছিল।

—তা ছিল, তবে তুমি কিশোরীটিকে হত্যার পর তা ছিল রেড-এর কাছে।

—আপনারা তা প্রমাণ করতে পারেন না।

—এক মিনিট। পারব আমরা তা প্রমাণ করতে, তুমি বলেছিলে যখন তুমি ষাট সেন্ট ডোনাকে দিয়েছিলে সেই পাঁচটার পরে তুমি ওকে আর দেখো নি।

—তা ঠিক।

—তুমি বলছ তুমি ছটার মধ্যে ফিরেছিলে?

—হ্যাঁ তাই।

—তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি ছটার মধ্যে ফিরেছিলে ঠিকই তবে তুমি মদ কিনতে ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে। পথে হয়ত তুমি মেয়েটার কাছে কুপ্রস্তাব করেছিলে। সে যখন প্রতিবাদ করে, বোধ করি বাবা-মাকে বলে দেবে বলে শাসায়, তুমি ভাবলে মেয়েটা বালিকা এবং সত্যি সত্যি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। ঝটাপটির মুখে তুমি ওকে হত্যা করেছ। সত্যি নয় একথা? উত্তর দাও!

আমি জবাবের অপেক্ষা না করে বলে চললাম, ডোনা পকেটে খুচরো নিয়ে একমাত্র তুমি ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই সার্কাসের মজা ছেড়ে বাইরে যেত না। তুমি মধুরভাষী, দেখতে সুন্দর, তাই মেয়েটা তোমাকে মিত্র ভেবেই গিয়েছে। তুমিই তাকে হত্যা করেছ। যে গাড়ি তুমি চালিয়েছিলে তার মধ্যে মেয়েটার জুতোর ছাপ আমরা পেয়েছি।

প্রতিবাদরত থাকা সত্ত্বেও করক ভিনসেন্টকে আমরা তুলে নিয়ে চললাম। ওর প্রতিটি কথা মিথ্যে প্রমাণিত হল। লেবরেটরী টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে যে ওর শার্টে মানুষের রক্ত লেগেছিল। গাড়ি ও জুতোর ছাপ প্রকৃতই ডোনার পায়ের। একজন নামকরা বোটানিস্ট পরীক্ষা করে বললেন গাড়িতে পাওয়া লতাগুল্মের বৃন্তের অংশবিশেষ যেখানে ডোনার মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেই অঞ্চলের।

১৯৫৪-এর ২৪শে জুন কুয়েসনেল আদালতের জুরীরা ভিনসেণ্টকে অপরাধী বলে অভিহিত করল।

আইন বিষয়ক ভুলভ্রান্তির দরুণ ওর মামলা তৃতীয়বার কোর্টে উঠল।

১৯৫৫-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী ছ'জন জুরী ওর মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ করল। ভিনসেণ্টের আপীল না মঞ্জুর হল।

সে বছর জুন মাসের ১৪ তারিখে ভিনসেণ্ট তার সোনালী কেশ এলোমেলো করে চিৎকার সহকারে অভিশাপ দিতে দিতে ফাঁসী মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার নিষ্প্রাণ দেহ ফাঁসীর রজ্জুতে দোদুল্যমান হল।

এক বোতল কাচাকা
(রিয়ো ডি জেনেরিও)

পুলিশ চীফ আলফানসো মার্টিনেল্লি বললেন ঃ

যে রাত্রে মার্ডার হয়, বাইরে থেকে বোঝবার উপায় ছিল কি? রিও ডি জেনেরিও নগরী আলোয়, আনন্দে স্ফূর্তিতে, সুরা নারী ও নৃত্যে তখন উল্লাসমত্ত, যেমন হয়ে থাকে এ শহরে প্রতি রাত্রে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, সমুদ্রতীরের রাস্তাসহ যাবতীয় শহরের অলিগলি রাজপথ চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাইতে জমজমাট। গৃহে গৃহে হোটেলে রেস্তোরাঁয় আনন্দপ্রেমী নরনারীর কথাবার্তা হাসি উল্লাস পুরোদমে চলছে। দামী দামী সুগন্ধী মদের সঙ্গে নারীদেহ বাহিত নানা পারফিউমের সুগন্ধ মিশে সে এক মন-মাতানো আবহাওয়া।

এটা হল ধনী স্বচ্ছল মানুষের নৈশ জীবন যাপনের চিত্র। নয়ন মনোহর কোপাকাবানা সমুদ্রতীরস্থ স্থান থেকে উপর দিকে পাহাড়ের মাঝামাঝি জীর্ণ কুটির সম্বলিত যে সব বস্তী, সেখানে থাকে দরিদ্র হাড়হাভাতে সন্দিগ্ধ চরিত্রের মানুষরা। তাদের ঘর বা রাস্তায় বিজলী বাতি নেই। অন্ধকারে ঘেরা রহস্যময় অঞ্চলের গৃহে গৃহে কেরোসিনের ডিব্বা বা মোমবাতি জ্বলছে টিম টিম করে। সেখানে হৈ হুল্লোড় নেই, নেই কোন আমোদ স্ফূর্তির অট্টহাসিসহ উল্লাস। নিরব নিথর গরীব অর্ধাহারী নরনারীর বস্তী ওগুলো। মরচে পড়া ভাঙা টিনের চাল থেকে তখনো ফোটা ফোটা জল ঝরে পড়ছিল।

অকস্মাৎ সেই তমসা ঘেরা বস্তীর একটা কুটীরের অভ্যন্তর থেকে ভেসে এল কিছু ক্রুদ্ধ কণ্ঠের কথাবার্তা, অতঃপর এক চরম আর্তনাদ ধ্বনী, পরমুহূর্তে আবার পূর্ববৎ নিরবতা নেমে এল সারা বস্তীতে।

মোমবাতি বুঝি নিভে গিয়েছিল বা নিভিয়ে দিয়েছিল, পরমুহূর্তে সেই কুঁড়ে ঘর থেকে একটা ছায়ামূর্তি দ্রুত বেরিয়ে এসে চোখের পলকে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঐ সন্দিগ্ধচরিত্র অধ্যুষিত বস্তীতে, কেউ কারুর পরোয়া করে না, সমাজ সংসার বলতে কারুর কোন পরোয়া নেই। কেউ কারুর অধীনে বাস করে না। খুন-খারাপী যার যার নিজস্ব ব্যাপার, অতএব পরের দিন সকালের আগে নিহত রমনীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল না। সকালেই পুলিশে সংবাদ গেল।

কুৎসীৎ বস্তী কুৎসীৎ রাস্তাঘাট, কুঁড়ে ঘরটার সামনে উলঙ্গ প্রচুর শিশুসহ বিরাট ভীড় হটিয়ে তবে গিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ইতিমধ্যে ঐ ভীড়ে থাকা কয়েকজন দাগী ও ছিঁচকে চোর চোখের পলকে সেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেল। পাহাড়ে উঠতে বেশ হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম।

ইতিপূর্বে আরও অনেক কেস-এ এ অঞ্চলে এসেছি। সেই একই চেহারা ঘরের ভেতরকার। সস্তা কাঠের আধভাঙা টেবিল, চেয়ার, কয়েকটা নোংরা কম্বল এক কোণে জড়ো করে রাখা। সেই হাওয়া বাতাস আলোর অভাবের দরুণ ভ্যাপসা ড্যাম্পের গন্ধ। এবড়ো খেবড়ো মেঝে। দেওয়াল ছাদ প্রভৃতি শহর থেকে চুরি করা সাইন-বোর্ডের টুকরো টিনে তৈরী। এই ঘরের মেঝেতে মৃত স্ত্রীলোকটির দেহ মুখ থুবড়ানো অবস্থায় পড়ে ছিল, দুহাত দুদিকে ছড়ানো।

আমি নিচু হয়ে মৃতদেহ চিৎ করে দিলাম। এক কালে সুন্দরীই ছিল মনে হয়। কিন্তু এখন মধ্যবয়স্কা প্রাণহীন স্ত্রীলোকটির মুখ দেখে মনে হল বহু ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃখ কষ্টের তুফান বয়ে গেছে এর জীবনে। চামড়া কোঁচকানো। নোংরা, অযত্নে বর্ধিত পাকা পাকা এক গুচ্ছ চুল এসে পড়েছে নিষ্পলক চেয়ে থাকা খোলা চোখের উপর। কোন বলপ্রয়োগ বা ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই। অথচ বস্তীবাসীরা সমানে চিৎকার করছে "খুন হয়েছে" বলে।

দরজায় ভীড় করা কিছু পলাতক আসামীর মুখও নজরে পড়লো। এখন ওদের ধরার সময় নয়, পরে দেখব। আগে খুনের কেস-এর ফয়সালা করতে হবে।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। জানি এদের কাছ থেকে সঠিক কোন খবরই পাওয়া যাবে না, তবু। এরা কমবেশী আইন ভঙ্গকারী দাগী। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই আর কি, কে কার বিরুদ্ধে মুখ খুলে, কখন কি বিপদে পড়বে, কোথাকার কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে নিজের ঘরে সাপ উঠবে এই অনিশ্চয় ভয়েই অস্থির এরা। সবাই সততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললো, না তারা কোন চিৎকার বা আর্তনাদ বা অস্বাভাবিক কিছুই শোনে নি। শুনলে অবশ্যই তারা পুলিসকে কাল বিলম্ব না করে জানাতো।

বুঝলাম এদের সাহায্য পাওয়া যাবে না খুনী-সন্ধানে। ধার্মিকের বাচ্চা সব এরা।

অন্তত একটা সত্যি জবাব এরা দেবে, জিগ্যেস করলাম,—এই নিহতা রমনীর পরিচয় কি?

কে একজন বললে, এলসা স্যার।

—পুরো নামটা কি?

—পুরো নাম আমাদের কখনো বলেনি স্যার।

—এর জীবিকা কি ছিল?

– এলসা ভিখিরী ছিল। ভিক্ষে করত স্যার।

—আর কোন পন্থায় অর্থ উপার্জন করত কি?

—আমরা সেরকম কিছু জানি না স্যার।

—বিবাহিতা?

—যদি হয়েও থাকে আমরা কখনো ওর স্বামীকে দেখি নি।

—কেউ বাস করত ওর সঙ্গে?

—আমরা কাউকে দেখি নি।

—এর বিষয়ে আর কেউ কিছু জানো?

—সে কি মেজর মার্টিনেল্লি, জানলে কি আমরা আপনাকে সানন্দে সব বলতাম না …?

সেই পুরনো প্যাঁচ। ফিরে গেলাম সেই কুঁড়ে ঘরে আবার। পুলিস ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করেছে, বললে, মাথায় আঘাত করা হয়েছে। খুলি ভেঙেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। বয়েস হবে মোটামুটি ৪৫ বৎসর। অপুষ্টিতে ভুগছিল। ঘণ্টা দশেক হল মারা গেছে।

তাহলে খুন হয়েছে গত রাত্রে ১০ টায়। তখন আমি স্ত্রী সহ একটা মিকিমাউস সিনেমা দেখছিলাম।

ডাক্তারের মতে স্ত্রীলোকটি প্রচুর মদ্যপান করেছিল। ঘরের মধ্যে কাচাকাব একটা খালি বোতল পাওয়া গেল। আমি হাত দিয়ে তুলে শুঁকলাম। সেই তীব্র বিদঘুটে গন্ধ। আঁখ থেকে তৈরী স্থানীয় সস্তা দামের অতীব কড়া মদ এই কাচাকা। মুহূর্তে সমস্ত ভাবনা চিন্তা ভুলিয়ে দেয়, সবপ্রকার ব্যথা মিলিয়ে যায় মাত্র কয়েক ক্রুজেইরোজ মূল্যের বিনিময়ে।

আমি বোতলটা কাগজমুড়ে সঙ্গে নিলাম। সহকারীকে বললাম স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে।

* * * *

মৃত দেহের আঙুলের ছাপ নিয়ে দেখা গেল স্ত্রীলোকটি দাগী আসামীই বটে। নাম এলসা কোয়েলহো। ৪৭ বয়েস। ছিঁচকে চুরির বহু রেকর্ড রয়েছে। খুনের ক'দিন আগে দশ দিনের জেল খেটে বেরিয়েছে। কাচাকা বোতলে ওর আঙুলের ছাপ আছে। আর বোতলের গলার নীল কাঁচে হাতের মাঝখানের ছাপও রয়েছে দেখা গেল। সে ছাপে আয়ুরেখা এবং ঊর্ধ রেখা দেখলাম বোতলের মোটা অংশের দিকে ওলটানো। মনে মনে কৌতুককর একটা চিন্তা এল যে একজন জ্যোতিষি এই হস্তরেখা বিচার করে হয়ত বলতে পারত এলসার এই চরম অপঘাত ওতে লিখিত আছে কিনা।

এলসা ভিক্ষে করত। সারা শহরময় অসংখ্য ভিখিরী। কাকে খোঁজ করব? কার কাছ থেকে সংবাদ পাই? আসামী ধরার চান্স খুবই ক্ষীণ। শহরের ভিখিরীরা বদমাইস দাগী হয় ঠিকই, তবে তারা খুবই নগণ্য ক্ষেত্রে খুনী হয়। স্বজাতিকে খুন করা তার বোধকরি আসে না। ওদের স্বজাতিপ্রীতিও প্রবল। তাই ওর কমরেড ভিখিরীরা অনেকেই নানা সংবাদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে লাগলো।

ওদের মুখে শুনলাম ঃ এল্সা এককালে পরমা সুন্দরী ছিল। একটা ফার্মে চাকরানীর কাজ করতো। পরে ফার্ম মালিকের ছেলে ওকে ফুসলে এনে উপভোগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় এই জঘন্য জীবনে।

ওর কোন শত্রু ছিল না। ও নাকি আর্নেস্টো নামীয় অপর এক ভিখিরীর সঙ্গে বাস করত। তবে দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়াঝাঁটি হত।

হতে পারে এ বেটাই আসামী। ভিখিরী ভিখিরীনির প্রেম··· মাল খেয়ে কুঁড়েঘরের মধ্যে মাতালের ঝগড়া···রাগের মাথায় প্রণয়িণীর শিরে চরম আঘাত ··এভাবেও ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু ঐ আর্নেস্টোকে কোথায় পাওয়া যাবে? ক'দিন নাকি তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সে নাকি সাইনে ল্যাণ্ডিয়া অঞ্চলের থিয়েটারের সামনে ভিক্ষে করত। পুলিশ হেড কোয়াটার্সে গিয়ে একজন ভিখিরী আমাদের আসামী—ফটো অ্যালবাম দেখে ঐ আর্নেস্টোকে সনাক্ত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে খোঁজ খবর শুরু হয়ে গেল। তিন দিন বাদে আর্নেস্টোকে শহরের এক অঞ্চল থেকে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হল।

ফটোর সঙ্গে মিল প্রায় নেই। এখন ময়লা চাপ দাড়িতে আর রক্তরাঙা চোখ দুটিতে এবং কুৎসিত অভিব্যক্তিতে মনে হয় অন্য মানুষ। কিন্তু এইই আর্নেস্টো। ছোটখাটো নার্ভাস মানুষ।

এলসার একটা ফটো দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, এই স্ত্রীলোকটিকে চেনো?

—নিশ্চয় চিনি, মাতাল কণ্ঠে মাথা নাড়ে আর্ণেস্টো, আমরা মানে আমরা দুজন বন্ধু ছিলাম।

—তুমি জানো কি এই এলসা খুন হয়েছে?

বিস্ময়ে চোখ বড় হল আর্ণেস্টোর।

—আর এ খুন হবার আগে তোমার সঙ্গে খুব মারামারি হয়েছে?

আর্ণেস্টো চুপ করে রইলো হতভম্ব হয়ে।

— কেন এ কাজ করেছ?

—আমি? ঈশ্বরের দিব্বি, আমি ওকে খুন করিনি···বলে সহসা প্রবল ভাবে কাশতে লাগলো। বোঝা গেল লোকটা যক্ষ্মারোগী।

কাশি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, পরে বললাম, ঠিক আছে। আমি এবার সবকিছু জানতে চাই। কতদিন তুমি এলসাকে জানতে চিনতে, কেন তুমি ঝগড়া করতে ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু, বুঝলে?

আর্ণেস্টো মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললে চার কি পাঁচ বছর ধরে এলসাকে সে জানে। বছর দুই ধরে ওরা একসঙ্গে বাস করছিল। তারপরই ওর সতীত্বে সে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তিন সপ্তাহ আগে সে পুলিসের হাতে ভিখিরীর দলের সঙ্গে ধরা পড়ে জেল হাজতে কাটায়। বেরিয়ে এসে এলসাকে কোথাও খুঁজে পায় না। ওর তখন বিশ্বাস হল যে এলসা অন্য কোন লোকের সঙ্গে চলে গেছে। অবশেষে সে তার দেখা পায়। এলসা দৃঢ় ভাবে জানায় সে অবিশ্বাসিনী নয়। তাদের সাংঘাতিক ঝগড়া হয়, ঐ পর্যন্তই। তবে সে আদৌ খুন করেনি?

—যে সময় এলসা নিহত হয় সেই সোমবার রাতে তুমি কোথায় ছিলে?

আর্ণেস্টো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো বারেক, পরে বললে,—ডক এরিয়াতে ছিলাম। আমি সেখানেই সারারাত ঘুমিয়েছিলাম।

—কেউ তোমাকে দেখেছে? এটা প্রমাণ করতে পারবে?

—না, আমি প্রমাণ করতে পারব না।

—তাহলে সেদিন এলসার কাছাকাছি আদৌ যাও নি ?

—শপথ করে বলছি. আমি যাই নি।

—ঠিক বলছ যাও নি ?

—হ্যাঁ মেজর মার্টিনেল্লি ঠিকই বলছি। আমি সে রাতে এলসার কাছাকাছি যাই নি। আর আমি ও কাজ করিও নি।

আর কিছু করবার ছিল না। আর্নেস্টোকে ফের সেল-এ পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ ব্যাটাই আমাদের আসামী। ভিখিরীরা সব সময় দলবদ্ধ হয়ে থাকে। যদি ডক এরিয়ায় ও রাত কাটিয়ে থাকে তাহলে কেউ না কেউ অবশ্যই ওকে দেখে থাকবে। কিন্তু ও বলে কেউ নাকি দেখেনি। মিথ্যুক কোথাকার।

আর্নেস্টোই আসল খুনী। কিন্তু প্রমাণ করব কিভাবে ? সন্দেহের অবকাশে ওর খালাস হয়ে যাবে। এসব আইনের খেলা এ ভিখিরী প্রবরও অবশ্যই জানে।

এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে আর্নেস্টোকে আমি অজস্র প্রশ্নে জেরা করলাম। যতই জেরা করি ততই ব্যাটা বুঝতে পারে যে আমরা প্রমাণাভাবে আন্দাজে অনুমানে ওর বিরুদ্ধে ঢিল ছুঁড়ে চলেছি। ক্রমশ আমি হতাশ হয়ে চলেছি।

খুনের দশ দিন বাদে এক রাত্রে আর্নেস্টোকে নিস্ফল জেরা করে হতাশ এবং ক্লান্ত হয়ে বিরক্ত অবস্থায় নিজের বাড়ি চলে গেলাম।

বাড়ি ঢোকবার আগেই মেজাজটা শরিফ হয়ে গেল। কেননা নাকে ভেসে এল কিচেন থেকে মিসেস-এর রান্নাকরা বিশেষ এক লোভনীয় গন্ধ। দরজা খুলতে দু হাতে ময়দা মাখা অবস্থায় গিন্নি সহাস্যে বললে, দু মিনিটের মধ্যেই খাবার তৈরী হয়ে যাচ্ছে।

—আমার খিদে নেই, মনের মধ্যে তখনো আমার আর্নেস্টোর বিরক্তিকর ব্যাপার পাক খাচ্ছিল।

গিন্নি হেসে বললে, টেবিলে খাবার দেবার আগে পর্যন্ত এই একই

কথা বলো তুমি চিরকাল।

একটা চেয়াব টেনে বসে দেখলাম গিন্নি একটা মদের বোতল তুলে কেকের মিকশ্চাবে খানিকটা ঢাললো। পরে যখন বোতলটাকে নিচে রেখে দিল তখন বোতলের গলায় তার ময়দা মাখা হাতের তালুর ছাপ লেগে গেল, তাব আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা বোতলের ঊর্ধ্বদিকে অঙ্কিত হল।

আমি আবেকবার তাকালাম সেদিকে, তারপর সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে দিনেব মত স্পষ্ট খোলসা হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেব কোটটা হাতে নিয়ে আমি উঠে পড়ে "আমি পবে আসছি" বলে তৎক্ষণাৎ দ্রুত বেবিয়ে গেলাম।

আমার এ ধবনের অদ্ভুত ব্যবহাব হয়ত গিন্নীব কাছে পাগলেব মত মনে হয়েছিল। তবে একজন ডিটেকটিভেব স্ত্রীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে আজকেব ডিনাবও মাটি হল।

আমি দ্রুতবেগে অফিস পানে চলে গেলাম। এবার আমি নিশ্চিত যে ঐ খুনেব মামলা প্রমাণ করতে পারব।

তেমনি নিরুদ্বিগ্ন হাসি মুখ নিয়েই আর্ণেস্টো আমাব সামনে এল। তবে আমাব সুগম্ভীব মুখ দেখে সেভাব তাব মুহূর্তে অন্তর্হিত হল।

আমি ঠাণ্ডা শান্ত গলায় বলে উঠলাম, আমি তোমাকে খুনের জন্য দায়ী করছি। বলে ড্রয়ার থেকে কাচাকা বোতলটা বেব করলাম, যেটার দ্বারা এলসা খুন হয়েছিল।

বোতলটা দেখেই আর্ণেস্টো বুঝে নিল তার মিথ্যার আয়ু শেষ হয়ে গেল। থতমত কণ্ঠে সে বলে উঠলো, না, না, মানে আমি ওটা চাইনি। ওটা একটা সাংঘাতিক ভুল মানে ইয়ে হয়ে গেছে।

অসহ্য লাগাতে বলে উঠলাম, হ্যাঁ ভুলই বটে। বোতলটা ওখানে ফেলে আসার মস্ত ভুল। প্রথমটা আমরা ভেবেছিলাম বোতলেব গলায় হাতের তালুর ছাপটা এলসার নিজেরই। আমাব আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে হাতের তালুর দীর্ঘ লাইনগুলি নিচের দিকে মুখ

করা রয়েছে। যার অর্থ হল যে-ই ওটা ধরে থাকুক সে-ই মদ ঢালবার প্রয়োজনে ওভাবে ধরে নি, বা ধরা যায়ও না। সে ধরেছিল বোতলটিকে উলটে গদার মত করে কাউকে আঘাত হানবার মানসে।

বোতলটা দর্শনমাত্রই ওর মানসপটে বোধকরি সেই খুনের রাতের দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। আর পারলো না। ও এখন আমার কাছে করুণা বা মার্জনা ভিক্ষা করতে লাগলো। রুদ্ধ-কণ্ঠে জানালো, সে মদ খাচ্ছিল তখন, সে সময় ওর সতীত্ব নিয়ে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল, আমি তখন একটা বোতল দিয়ে ওর মাথায় প্রচণ্ড একটা ঘা দিয়ে পালিয়ে যাই। এইভাবে স্বীকারোক্তি করল সে।

এরপর অবশ্য ওর হাতের তালুর ছাপ মেলানোর প্রয়োজন ছিল না। তবু করলাম এবং তা মিলেও গেল।

এ কেসটার শেষে একটা বিস্ময় ছিল। জজের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান শুনেও আর্নেস্টো তত ঘাবড়ালো না যতটা বিচলিত হল আমার কথা শুনে যে এলসা তার প্রতি আদৌ বিশ্বাসঘাতিনী ছিল না।

আর্নেস্টো যখন দশদিনের জেলহাজত থেকে বেরিয়ে এসে এলসাকে খুঁজে না পেয়ে ওর সতীত্বে সন্দিহান হয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিল সে সময় প্রকৃত পক্ষে এলসা ভবঘুরে বৃত্তির অপরাধে কারারুদ্ধ ছিল।

সুতরাং আর্নেস্টো যখন এই ঈর্ষা বিষে ভুগছিল যে এলসা অন্য কোন প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে আসলে সে তখন পুলিশ হাজত এবং কারাগারে বন্দিনী ছিল।

*   *   *

আজ বছর চারেক বাদে যখন আমি রিও ডি জেনেরিও-র ডিটেকটিভ চীফ হয়েছি, আজও আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে যে আমি যখন সেদিন ফের বাড়ি ফিরে গেলাম তখনও আমার জন্য গরম গরম কেক অপেক্ষা করছিল।

আমার মনে হয়েছিল সেদিনকার কেকটার মত এত সুস্বাদু খাদ্য

বুঝি তুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই।

আমি আমার স্ত্রীকে তার এক্সপার্ট কেক তৈরীর কথা বলাতে তিনি সহাস্যে কৌতুক করে বলেছিলেন,—এইজন্যেই বলি আমার কাছে কাছে থেকো। তোমার অফিসের চেয়ে যদি বেশী সময় আমার রান্নাঘরে অতিবাহিত করো তাহলে তুমি অবশ্যই অনেক বেশী কেস সল্‌ভ্‌ করতে পারবে।

শুনে আমরা তুজনেই নির্মল কৌতুকে প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠেছিলাম।

———

বিবাহ বিশারদ

(বেলগ্রেড, যুগোশ্লাভিয়া)

বেলগ্রেড-এর পুলিস-চীফ যোশেফ জ্যাগেব্রোভিচ বললেন ঃ

প্রত্যেক যুবক ডিটেকটিভ-এর কাছেই তার জীবনের প্রথম কেসটির কথা চিরকাল স্মরণে থাকে। কেননা ভুল করে সে ভাবে সেটির সফলতা বা বিফলতার ওপরেই তার কেরিয়ার নির্ভর করবে। আসলে তা নয়। কত নগণ্য সূত্রই যে সম্ভাব্য সফলতা ও বিফলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আমার নিজের জীবনের প্রথম কেসটির স্মৃতিও খুবই বেদনাদায়ক।

সে ঘটনার এতদিন বাদে, ইতিমধ্যে আমি বেলগ্রেডের পুলিস চীফ হয়ে গেছি, আজও কিন্তু জীবনের প্রথম কেস-এর হতাশা ব্যঞ্জক অভিজ্ঞতাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি। অবশ্য বিফলতার মধ্যেই সফলতার বীজ নিহিত থাকে এই স্পার্টান ফিলজফির সম্যক জ্ঞান আসতে বেশ সময় লাগে বৈকি।

সবে চাকুরীতে ঢুকেছি, রাজার অধীনে তখন যুগোশ্লাভিয়া, নগণ্য মাইনের ডিটেকটিভ আমি। সেই ১৯৩৫-এ একদিন চরম উত্তেজনায় আমি উদ্বেল হয়ে উঠলাম যখন আমার ঠিক ওপরওয়ালা গোয়েন্দা সাহেব আমাকে তাঁর ক্ষুদ্র অফিসঘরে ডেকে জিগ্যেস করলেন, যোশেফ, তুমি আমেরিকা যেতে রাজি আছ?

—বলেন কি স্যার, আমি প্রায় লাফিয়ে উঠি, একশবার রাজি। তা ছাড়া আমি ইংরেজী ভাষাটাও মোটামুটি ভালই জানি।

—আরে বৎস, সেই কারণেই তো তোমাকে এই সুযোগ দিচ্ছি হে, অফিসার বললেন, এই ফাইলটা নাও, এতেই আসামীর যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভালভাবে পড়ে নাও। আমি চাই লোকটাকে

আমেরিকা থেকে সরাসরি যুগোশ্লাভিয়ায় নিয়ে আসতে। এখানে ওর বিচার হবে। তবে কি ভাবে আনবে সেটা আমি জানি না, সেটা হবে তোমার গোয়েন্দাগিরির কৌশল। কিন্তু ক্রিমিনালটাকে নিয়ে আসতেই হবে। দীর্ঘদিন ধরে পাষণ্ডটা নারী শিকার করে ফিরছে। লোকটা তার ভাবী পত্নীদের অন্তত একজনকে হত্যা করেছে এ খবর আমাদের আছে। তার সাধনোচিত স্থান হল যুগোশ্লাভিয়ার কারাকক্ষের অভ্যন্তর।

এই ভাবেই আমি জানতে পারলাম আইভ্যান পডারজয় নামক যুগোশ্লাভিয়ায় জাত প্রবঞ্চক, বহু ধনাঢ্য নারী শিকারী পাকা অপরাধীটিকে। সংবাদে প্রকাশ লোকটাকে তুনিয়ার তাবৎ দেশে ঘুরতে দেখা গেছে। ইয়োরোপ থেকে আমেরিকা। ফের ফিরে এসেছে ব্রিটেনে, ফরাসীদেশে, জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়াতে। শেষ কুকর্মস্থল হল ভিয়েনা।

মাসখানেক বাদে এসে উপস্থিত হলাম নিউইয়র্কে। অনুসন্ধান শুরু করলাম। সংবাদ পেলাম লোকটা তার তথাকথিত ধনী প্রেমিকাদের অর্থে রাজার হালেই শুধু জীবন যাপন করে না, সে পূর্বাহ্ণেই পুলিসের গন্ধ পেয়ে যায় এবং যথাসময়ে বিদ্যুৎগতিতে সরে পড়ে। এতই চতুর আসামী সে।

মার্কীন ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট ওর সঠিক খোঁজ খবর তেমন রাখে না। স্থানীয় যুগোশ্লাভ নাগরিকরাও বছরখানেক আগে ওকে দেখেছিল এখানে। নিউইয়র্ক পুলিস অবশ্য জানালো যে পডারজয় হাওয়া হয়ে যাবার পূর্বে জনৈকা মেয়েকে বিয়ে করেছিল এ সংবাদ তাদের আছে। এই মেয়েটির নাম অ্যাগনেস টাফভারসন, এ নগরীর প্রখ্যাত কর্পোরেশন ল'ইয়ার। বয়েস তেতাল্লিশ, খুবই চালাক চতুর বুদ্ধিমতী মহিলা। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নিরালা একক জীবন যাপন করতো।

মানহাট্টানের লিটল চার্চের যাজকের কাছ থেকে জানলাম, যুগোশ্লাভ ভদ্রলোকের বিয়ের কথা তাঁর স্মরণে আছে। ক'জন প্রায় অপরিচিত সাক্ষীর উপস্থিতিতে শান্ত নিরব অনুষ্ঠানে বিবাহকার্য সমাপণ হয়। বিয়ের পরেই বর-কনে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। এর পরের সংবাদ তিনি জানেন না।

আরেক উৎস থেকে সংগ্রহ করলাম বেচারা উকীল মহিলার রোমান্সের কাহিনী। বিয়ের কয়েক মাস আগে নাকি সে ইয়োরোপ বেড়াতে যায়। সেখানে ফরাসী রিভিয়েরতে (ভূমধ্যসাগরের উপকূল) পডারজয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। লোকটার আকৃতি-প্রকৃতি সর্বদাই রমণীমোহন ধরণের। পডারজয় নাকি মহিলাটিকে জানায় যে সে একজন প্রাক্তন যুগোশ্লাভ সামরিক অফিসার, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর অর্থাদির অপ্রতুলতা নেই। কতগুলো পেটেন্ট ব্যাপারে তার নাকি আন্তর্জাতিক ব্যবসাবানিজ্য ও লেনদেন বর্তমান। পডারজয় কথায় বার্তায় নায়কোচিত মনোরম, নম্র, শিক্ষিতও বটে, তাছাড়া আন্তর্জাতিক ল' সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ওর আচার আচরণ হাবভাবে অ্যাগনেস মুগ্ধ হয়ে যায়। যখনই দেখা হত কি চমৎকার আভিজাত্যে সে মহিলাটির হস্ত চুম্বন করতো। উকীল মেয়ে সে, সেও ধূর্তচতুর সন্দেহ নেই কিন্তু এই রোমান্টিক মানুষটা তাকে এমনভাবে পাগল করে তুললো যে একে ভাল না বেসে উপায় রইল না। বিশেষ করে মহিলা এমন একটা বয়সে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন, যখন ভালবাসা শুধু-মাত্র অন্ধ নয়, করুণভাবে জন্মান্ধ বলা যায়।

সেই ভালবাসায় অন্ধ হয়ে যাওয়া মেয়ে একটু খোঁজ করলেই জানতে পারতো, কোঁকড়ানো কেশদাম, বৃষস্কন্ধ, বয়েস অনুপাতে যুবকদর্শন লোকটা আসলে চোর, ছ্যাঁচোর, প্রবঞ্চক মাত্র। শুধু মাত্র তার মাতৃভূমির পুলিসই তাকে খুঁজে ফিরছে না, দুনিয়ার আট দশটি দেশও তার অজস্র অপরাধ কর্মের জন্য সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। মহিলাটি এই সুদর্শন রোমান্টিক মানুষটির হস্তলগ্ন হয়ে ইয়োরোপের নানা দেশ

ভ্রমণের নেশায় মশগুল হয়ে রইলো। ভিয়েনাতে বড় বড় হোটেলে, নাইট ক্লাবে নর্তনে ভোজনে পানীয়তে মেয়েটির দিনরাত কাটতে লাগলো এক স্বপ্নরাজ্যে।

অ্যাগনেস ফিরে গেল নিউইয়র্কে একাই। তার বন্ধু-বান্ধবেরা অবাক হয়ে দেখলো উকীলমহিলা যেন কিশোরীর ডগমগ ভাব নিয়ে দেশে ফিরেছে। প্রণয়ের স্বাদে বয়েসও কমে গেছে যেন। অধীর প্রতীক্ষা বেশিদিন করতে হলনা। ১৯৩৩ এর নভেম্বরে তার দয়িত এসে মিললো আমেরিকায়। মাতৃভূমি যুগোশ্লাভিয়ার পুলিশ তখন হন্যে হয়ে পডারজয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বদেশে।

এই আঁচ পেয়েই বোধ করি সে যঃ পলায়তি স জীবতি পন্থা অনুসরণ করে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিল। নিউইয়র্কে এসে সে গ্র্যামারটি পার্কের এক ক্ষুদ্র হোটেলে আশ্রয় নিল।

ইতিমধ্যে সহসা এলার্জীরোগে শয্যা নিল অ্যাগনেস। এই ঘটনা পডারজয়ের পক্ষে এক চমৎকার সুযোগরূপে এল। প্রাণ দিয়ে সে সেবাযত্ন করে মহিলাকে সুস্থ করে তুললো। প্রেমের বন্ধন কঠিন নিগড়ে বাধা হয়ে গেল। ভাল হয়ে তারা রাতের পর রাত সেরা সেরা হোটেল-এ ডিনার আর ব্রডওয়ের নামকরা শো-সমূহ দেখে ফিরতে লাগলো।

স্বল্পকালের কোর্টশিপ। অতঃপর সে বছরের ৪ঠা ডিসেম্বর বিবাহান্তে পডারজয় এসে উঠলো পত্নীরই অ্যাপার্টমেন্টে। ঘটনা এত দ্রুত হয়ে গেল যে কনের আত্মীয়স্বজনও হবু বরকে দেখলো না চিনলো না জানলো না।

মন্ট্রিলে এক বোনের কাছে অ্যাগনেস নেমন্তন্ন না করার জন্য ক্ষমা চেয়ে লিখলো, আমি বিয়ের ছয় ঘণ্টা আগেও জানতাম না যে এই স্বপ্নের মানুষটাকে বিয়ে করব আমি। ডার্লিং, আমি আমার হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা দিয়ে পেয়েছি ওকে। এমন চমৎকার মানুষ ছুনিয়ায় ছুটি পাবে না, বিশ্বাস করো। ওয়াণ্ডারফুল ম্যান।

অ্যাগনেস-এর আত্মীয়স্বজনরা আমাকে বলেছে, পডারজয় নাকি ফোনে তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। বলেছে প্রথমে তারা ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে হনিমুন কাটাতে, পরে কিছুকাল তারা জার্মানীর এস্টেটেও বাস করবে, আরও বলেছে, অন্তত আগামী ছ মাস ওকে আপনারা দেখতে পাবেন না। কেননা জার্মানীর পর আমার জন্মভূমি যুগোশ্লাভিয়ায় ওকে নিয়ে যাব স্বদেশ দেখাতে, বলতে পারেন শ্বশুরবাড়ীর দেশে।

হনিমুনে যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে অ্যাগনেস কদিন খুব ব্যস্ত রইলো। কেনাকাটা, টাকাপয়সা সংস্থান। ব্যাঙ্ক থেকে ২৫০০০ ডলার তুলে ৫০০০ হাতে রেখে বাকি অর্থটা তার প্রিয়তম 'ক্যাপ্টেন'-এর (মহিলা জানতো তার স্বামী প্রাক্তন ক্যাপ্টেন) হাতে তুলে দিল। দুজনের নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হয়ে লণ্ডনে ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে তাদের পৌঁছনোর অপেক্ষায়। ক্যাপ্টেন ও মিসেস পডারজয়, তদানিন্তন নাৎসী পতাকাধারী জার্মান লাইনার 'হামবুর্গ' জাহাজে করে ২০শে ডিসেম্বর ইংলণ্ড পাড়ি দেবে এই ছিল সম্ভাব্য পরিকল্পনা।

জাহাজ ছাড়বার কিছুদিন আগে অ্যাগনেস গিয়ে জাহাজের শুধুমাত্র তার নামাঙ্কিত কেবিনে কিছু মালপত্র রেখে এল। স্বামীর নাম কিন্তু প্যাসেঞ্জার লিস্টে পাওয়া গেল না। পডারজয়কে এত বেশী বিশ্বাস করত অ্যাগনেস যে এই ব্যাপারটাকে সে সামান্য ক্লারিকাল মিসটেক ভেবে এর পেছনে কোন দুষ্ট চক্রান্ত থাকতে পারে সে চিন্তাই করলো না। অবশ্য এ ব্যাপারে পডারজয় তার স্ত্রীকে কি কারণ দর্শিয়েছিল তা অদ্যাপি পাওয়া যায় নি। শুধু ফ্লোরা মিলার নাম্নী অ্যাগনেসের জনৈকা পরিচারিকার কাছে জানা যায় মহিলা নাকি তাকে বলেছিল তার স্বামীর ব্যবসার আকস্মিক একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণে তাকে কদিন পরে অন্য জাহাজ ধরতে হবে। এ জাহাজে মহিলা একাই যাবে।

এর ভেতর অপরাপর লোকের সাক্ষ্যে জানা যায় সে নাকি খোঁজ করছিল কোথায় এমন একটি বড় ট্র্যাভেলিং ট্রাঙ্ক পাওয়া যায়, যেটার মধ্যে তার ভ্রমণের যাবতীয় পোষাকপত্র একবারেই ধরে। থার্ড

অ্যাভেন্যুতে সে ঐ ধরণের একটি বিশাল ট্রাঙ্ক কেনে। দোকানী সেটি উক্ত অ্যাপার্টমেন্টের বেসমেন্ট প্রকোষ্ঠে ডেলিভারী দেয়। সে রাত্রেই পডারজয় এক ড্রাগ স্টোরের মালিক সিমেয়স ফিয়নগোল্ডের সঙ্গে দেখা করে। দুজনে ইয়োরোপ-এর তদানিন্তন রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে। এক সময় ফিয়নগোল্ড জানায় তাঁর আত্মীয়দের নিরাপত্তা সেখানে বিপন্ন। তখন পডারজয় আশ্বস্ত করে বলে যে জার্মানীর অধীশ্বর রূপে হিটলার কিছুতেই বেশীদিন টিঁকবে না। সে ঐ দোকান থেকে দশ ডলার মূল্যের রেজর ব্লেড, ক্লিনজিং ক্রিম ও কিছু শ্লিপিং পিল কেনে, এগুলো নাকি তার সমুদ্র যাত্রার সময় লাগবে। নিউইয়র্কের আইন অনুসারে শ্লিপিং পিল-এর ক্রেতা হিসেবে সে যথারীতি রেজিষ্টারে নিজ নাম সই করে।

এরপর সে স্ত্রীর অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে দেখে পরিচারিকা অ্যাগনেসকে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করছে। পরিচারিকা যেহেতু অনেক রাত্তির পর্যন্ত কাজ করেছে তাই তাকে পরের দিন ছুটি দিয়ে দেয়।

একটু বাদেই দরজায় নক্ শুনে সে অল্প-দরজা ফাঁক করে দেখে ফিয়নগোল্ড দাঁড়িয়ে। সে নাকি ওকে চেঞ্জ দেবার সময় দু ডলার বেশী দিয়ে দিয়েছে। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধভাবে সে দু ডলার দরজার ফাঁক দিয়ে ফেরৎ দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়।

পরের দিন আর অ্যাগনেসকে দেখা যায় না। সন্ধেবেলা শুধু দেখা গেল পডারজয় বেসমেণ্ট থেকে বৃহৎ ট্রাঙ্কটাকে টেনে নিয়ে এসেছে লিফ্ট-এর কাছে। পরদিন সকালে সে ওয়েস বারজার ট্রান্সপোর্ট কোংয়ে বলে ট্রাঙ্কটাকে নিয়ে হোয়াইট স্টার লাইনার 'অলিম্পিক' জাহাজে তুলে দিতে।

ওদের জনৈক-ক্লার্ক আগের ব্যবস্থাটা জানতো। তার প্রশ্নের উত্তরে পডারজয় জানায় "আমার স্ত্রী আগেই রওনা হয়ে গেছে। আমরা গিয়ে ইংলণ্ডে একসঙ্গে মিলিত হব।"

পরিচারিকাকে শোনায় অন্য কাহিনী। ২২শে ডিসেম্বর সে এসে

তাকে বলে "ম্যাডাম কদিনের জন্য ফিলাডেলফিয়া গেছেন।"

'ক্যাপটেন' যে কদিন ছিল পরিচারিকা ফ্লোরা তাকে সাহায্য করে। যখন ট্রান্সপোর্ট কোং চারটি ট্রাঙ্ক ও অন্যান্য মালপত্র জাহাজ "অলিম্পিকে" তোলে তখন পডারজয়ের আভিজাত্যের মুখোশ যেন সাময়িক খুলে গিয়েছিল। চিৎকার চেঁচামেচি করে নিজে সামনে থেকে মালগুলো ওঠানামা ও যথাস্থানে স্থাপনের ব্যাপারে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করেছে সে। অর্ধেক মাল ডেক-এর তলায় গেল। বড় ট্যাঙ্কটা সহ বাদবাকি মাল জলরেখার কিঞ্চিৎ ওপরে অবস্থিত তার কেবিনে রাখা হল। পোর্টহোল খুললে সমুদ্রজল সামান্য মাত্র নিচে বয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে যে কোন বস্তু অনায়াসে নিঃশব্দে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করা সম্ভব।

জাহাজ ছাড়বার কিছু আগে কনেহীন বর পডারজয় গিয়ে কেবিনে আশ্রয় নেয়। কেউ জানেনা অ্যাগনেস কোথায়, কি হয়েছে তার, কেউ তাকে আর চর্মচক্ষে দেখেও নি। পডারজয় বেশ খুশী খুশী নিশ্চিন্তই ছিল কেননা কেউ তাকে কোন উল্টোপাল্টা প্রশ্নও করেনি।

আটলান্টিক পাড়ি দেবার ছ'দিন সময় নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। পডারজয় এ সময়ের মধ্যে একবারও তার কেবিনের বাইরে আসে নি।

আমি 'অলিম্পিক' জাহাজের স্টুয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করি। সে জানায় ক্যাপ্টেন পডারজয় খুব হাসিখুশী ভদ্রলোক। মনে হয় ভদ্রলোক খুব হোম-সিক হয়ে পড়েছিলেন। স্বদেশী খাদ্যের জন্য খুবই উতলা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমেরিকা আমার জন্যে নয়, বড় বেশী বিরাট দেশ, সবাই অর্থোপার্জনের জন্য পাগল। যে দেশে জীবন সংগ্রাম একটা বিরাট সমস্যা সে দেশ আদৌ আমার পছন্দ নয়।

—ট্রাঙ্কটা খোলা অবস্থায় দেখেছিলেন কখনো? আমি প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ স্যার অনেকবারই দেখেছি। একবার বাক্স খুলে একটা

টাই বের করে পরতে দেখেছি।

—কেবিনে কোন প্রকার বাজে গন্ধ পেয়েছিলেন কী ?

—না স্যার, তেমন কিছু গন্ধ পাইনি।

পরে জেনেছি ইংল্যাণ্ডে এই 'ক্যাপ্টেনে'র জন্য অপেক্ষারতা ছিল তার আসল পরিণীতা পত্নী ফরাসী মহিলা মার্গারেট সুজান বারট্রাণ্ড, যাকে সে বিয়ে করেছিল ১৯৩৩-এর মার্চে। অ্যাগনেস হল তৃতীয় মহিলা যাকে পড়ারজয় (আমাদের জ্ঞানমতে) তথাকথিত "বিয়ে" করেছিল। আরও কত করেছিল কে জানে। অবশ্য আমাদের যুগোশ্লাভ রেকর্ড-এ আছে সে বেলগ্রেড-এ ও একজন ধনী মহিলাকে বিয়ে করে তাকে ফতুর করে দেয় অর্থে সামর্থে।

মার্গারেট স্বামীর বিরহ জ্বালা হাসি মুখেই সহ্য করেছে এইজন্যে যে সে জানে তাদের প্রয়োজনীয় আজগুবি সংখ্যক টাকা রোজগারের জন্যই স্বামী আমেরিকা গেছে। স্বামীকে একটি পত্রে সে লিখেছিল নিউইয়র্কে—"আমি কেয়ার করি না কি ভাবে তুমি টাকা সংগ্রহ করবে। যে ভাবেই হোক 'প্রচুর' 'প্রচুর' টাকা তুমি নিয়ে আসবে। তারপর আমরা দুজনে খুব মজা করে স্বচ্ছন্দভাবে জীবন যাপন করব।"

পড়ারজয় লণ্ডনে পৌঁছে অ্যাগনেস্-এর জড়োয়া গহনা মার্গারেটের অঙ্গে তুলে দিল, ড্রেসগুলো অলটার করে পরালো তাকে। নিরুদ্দিষ্ট অ্যাগনেস-এর ২৫০০০ ডলারের চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না আর।

অ্যাগনেস-এর আত্মীয়েরা জানতো যে সে তার 'স্বামীর' সঙ্গে 'হ্যামবুর্গ' জাহাজেই ২০শে ডিসেম্বর ইংলণ্ড রওনা হয়েছে। ওর বোন (মন্ট্রিলে) গ্যালি টাফভারসন লণ্ডন থেকে একটি কেবলগ্রাম পেল :

"—এখানকার আবহাওয়া ভাল লাগছে না। আমরা ইণ্ডিয়া রওনা হলাম। পরে কেব্‌ল্ করব। ইতি অ্যাগনেস।"

এরপর তিনমাস পার হয়ে গেল, এপ্রিলের শেষ অথচ বোনের

কোন সংবাদ নেই ইণ্ডিয়া থেকে বা অন্য কোথাও থেকে, তখন স্যালি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। অ্যাগনেস অতি চঞ্চল মেয়ে, সে এমন নীরব কেন ?

বোন গিয়ে উপস্থিত হল নিউইয়র্কের মিসিং পার্সন্স ব্যুরোর প্রধান ক্যাপ্টেন জন আয়ারের দপ্তরে।

পুলিশ-অফিসার এবার আইভান পডারজয়ের বিশদ বিবরণ চেয়ে পাঠালো বেলগ্রেডে আমাদের দপ্তরে। আমরা তার যাবতীয় বিবরণ, ক্রিমিনাল রেকর্ডসহ পাঠিয়ে দিলাম। পরে ওদের সাহায্যার্থে পডারজয়কে গ্রেপ্তারের ব্যাপারেই আমাকে ইয়োরোপ থেকে নিউইয়র্কে পাঠানো হয়।

নিউইয়র্ক থেকে ফিরে আমি যাই ফ্রান্সে। সেখানে ইণ্টারপোল এ সংবাদ দিয়ে এই নকল 'ক্যাপ্টেনের' গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেণ্ট বার করাই। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায় পডারজয় আমাদের যাবার আগেই বেপাত্তা হয়ে গেছে সে স্থান থেকে। অবশেষে সংবাদ আসে স্বামী-স্ত্রীকে ভিয়েনাতে দেখা গেছে। যে নগরে বেচারা অ্যাগনেসের সঙ্গে ওর দুর্ভাগ্যজনক ভাব পরিচয় মেলামেশার শুরু হয়। ওখানে নাকী ওরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী খুব বোলবোলাও জীবন যাপন করছে বলে সংবাদ আসে।

আমি ঝটতি ভিয়েনায় গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিটেকটিভদের সঙ্গে ওর মুখোমুখী হলাম। পডায়জয় দেখলাম এতটুকু ঘাবড়ালো না। বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অ্যাগনেস টাফভারসনকে চিনতুম বৈকি। খুবই চার্মিং লেডি। ওর কাজে লেগে আমি খুবই খুশী হয়েছিলাম। আমি ওর কিছুটাকা লণ্ডনে খাটিয়ে ছিলাম।

—আপনি ওকে বিয়ে করেন নি ? আমি প্রশ্ন করি ফরাসী ভাষায় যাতে করে ওর স্ত্রী মার্গারেট বুঝতে পারে আমার প্রশ্ন।

—বিয়ে ? অ্যাগনেস কে ? কি হাস্যকর কথা বলছেন। আমার সঙ্গে তার নামমাত্র পরিচয় হয়েছিল। নিউইয়র্কে বিয়ে ? কি আজগুবী

কথা বলছেন। আমি শুধু ওর সঙ্গে প্যারিসে সামারভেকেসন কাটিয়ে ছিলাম কটা দিন। অ্যাগনেস এখন ইণ্ডিয়াতে রয়েছে। আমি অবশ্য জানি না ও সেখানে একা আছে নাকি ওর সঙ্গে অপর কেউ রয়েছে।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে তখনকার মত চলে এলাম একটি বৃহত্তর কারণে। আমি ওর মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে দড়ি ছেড়ে দিলাম। যে দড়ি শেষ অবধি ওর গলায় ওঠে। আমি নিউইয়র্কে যে চার্চে ওদের বিয়ে হয়েছিল তার মিনিস্টারের কাছে সার্টিফিকেট চেয়ে কেবল করলাম।

এর কিছুদিন বাদে ফের আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম পডারজয়ের বাড়িতে। আমার হাতে এসে গিয়েছে নিউইয়র্কের গীর্জার বিয়ের সার্টিফিকেট। সেটা আমি 'ক্যাপটেন' ও তার স্ত্রীকে দেখালাম।

দেখে নিমেষে মার্গারেটের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল।

স্বামী অভয় দিয়ে বললে, না না মার্গারেট ভয় পেও না। এসবের সত্যি সত্যি কোন মানে নেই। বুঝলে, আমি বাধ্য হয়েছিলাম সেদিন বিয়ে করতে। আমেরিকানরা বড় সাংঘাতিক জাত। মানে ওটা ছিল একটা "সুবিধের বিয়ে"। অ্যাগনেস জানতো আমি বিবাহিত, আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। তুমি বিশ্বাস করো ডার্লিং··· ।

কিন্তু না মার্গারেট না আমি কেউই ওকে বিশ্বাস করলাম না। পরে অবশ্য পডারজয় সব কিছু অস্বীকার করলো, এমন কি বিয়েও। বললে, যখন ডিসেম্বরের ২০ তারিখে আমরা রওনা হব তখন অ্যাগনেস এর সঙ্গে আমার জাহাজ-জেঠিতে তুমুল ঝগড়া হয়। সে আমার রক্ষিতা রূপে ভ্রমণ করতে অস্বীকার করে। এবং বিয়ের জন্য জোর বায়না করতে থাকে। আমি রাজি না হওয়াতে সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। প্রথমে সে বলেছিল একাই সে জাহাজে যাবে। পরে অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে গিয়ে মন্ট্রিল রওনা হয়ে যায়। বলেছিল ফোন করবে কিন্তু করেনি। লণ্ডনে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল কিন্তু সেখানে আমি ওর দেখা পাই নি। তারপর থেকে অদ্যাপি আমার

সঙ্গে ওর আর সাক্ষাৎ হয় নি।

পডারজয় জোরের সঙ্গে বলে যে বিয়ের সার্টিফিকেট'টা সর্বৈব জাল। আমাকে যুগোশ্লাভিয়াতে একস্ট্রাডিসন করাবার মতলবেই এ জালিয়াতী। আমি অস্ট্রিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে শান্তিতেই আছি। আমি একজন রেফুজী আমাকে আর বেলগ্রেডে নেওয়া চলবে না।

ওর বাড়ি সার্চ করলাম। কোন কিছুই পাওয়া গেল না। সন্দেহ জনক মার্ডার ও অনুসন্ধান কার্যের মধ্যে বড় বেশী সময়ের ফারাক হয়ে গেছে। 'অলিম্পিক' জাহাজের কেবিনটিও পরীক্ষা করে দেখেছি। কিছুই পাওয়া সম্ভব হয়নি, কেননা ইতিপূর্বে সে কেবিন বহুবার ধোলাই পোছাই হয়ে গেছে। অ্যাগনেসএর নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিলমাত্র ক্লু পাওয়াও সম্ভব হল না। আমরা স্থির নিশ্চিত যে পডারজয়ই অ্যাগনেসকে হত্যা করে বেপাত্তা করেছে। কিন্তু সে কাহিনী প্রমাণ করবার সপক্ষে আমাদের হাতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। সন্দেহবশে তো কাউকে খুনের আসামী করে আদালতে তোলা যায় না।

পডারজয়কে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না ভিয়েনাতে, কেননা সে অস্ট্রিয়াতে কোন অপরাধ করেনি। রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ায় ওকে বেলগ্রেডে তুলে নিয়ে যাওয়াও সম্ভবপর হচ্ছে না।

আমরা বিচার করে দেখলাম কি ভাবে সে মহিলাটির দেহকে নিশ্চিহ্ন করেছে। এক হয় নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টেই সে অ্যাগনেস-এর মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে বাড়ির ইনসিনেটার মারফৎ ভস্মীভূত করে ফেলেছে। অপর থিওরী হল সে স্লিপিং পিল দিয়ে অজ্ঞান বা হত্যা করে ট্রাঙ্কে ভরে মেয়েটার দেহ জাহাজে তুলেছে। যে 'ক্যাপ্টেন', সর্বদা ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া ভ্রমণ করে না, সে কেন 'সি' ডেক-এ কেবিন নিয়েছিল? কেনই বা সে দশ ডলার মূল্যের রেজর ব্লেড, স্লিপিং পিল আর ক্লিনজিং ক্রিম কিনেছিল?

আমার নিজের মতে, মৃতদেহ উড়িয়ে দেবার সহজ পন্থা হল, দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মাছেদের খাওয়ানো। তাই সে করেছিল।

পডারজয় জানতো ভিয়েনাই হল তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। চতুর 'ক্যাপ্টেন' অস্ট্রিয়া সরকারকে বোঝালো তার বিরুদ্ধে এই জঘন্য অপরাধ দেওয়ার কৌশল হল তাকে নাকি যুগোশ্লাভিয়াতে নিয়ে যাওয়া। আসলে সে স্বৈরাচারী সম্রাটতন্ত্রের বিরোধী, সে চায় তার দেশও জার্মানী এবং ইতালীর মত ডিক্টেটরের অন্তর্গত হোক। এই তার অপরাধ।

'বাঁচো ও বাঁচতে দাও' এই আদর্শে বিশ্বাসী অস্ট্রিয়া সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হল না।

এখন একমাত্র পথ হল যেহেতু অ্যাগনেস ছিল মার্কিন নাগরিক এবং তারই রহস্যজনক নিরুদ্দেশের সঙ্গে এই লোকটা জড়িত, তাই আমেরিকান সরকারকে দিয়ে এক্সট্রাডিশন অর্ডার করাতে হবে।

ওদের কাছে আমরা কোরিয়ার মেলে পত্র দিলাম। আমরা জানিয়ে দিলাম ১৯৩৩এ পডারজয় যখন প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করে তখন সে কাগজপত্রে সই করেছিল অবিবাহিত বলে। অথচ পরে দেখা গেল সে মার্গারেট নাম্নী এক ফরাসী মহিলাকে আগেই বিয়ে করে গিয়েছিল।

সুতরাং এই মিথ্যা ডিক্লারেশনের দ্বারা সে পারজুরী অপরাধে অপরাধী।

১৯৩৪এর ২রা আগস্ট পডারজয়কে নিউইয়র্ক গ্র্যাণ্ড জুরী এক্সট্রাডিশন অর্ডার দিল। তারা ওকে বাইগেমি (বহুবিবাহ) চার্জে অভিযুক্ত করলো না। এবার অস্ট্রীয়ান সরকার ওকে বন্দী করলো।

আমার মনে দুঃখের সীমা রইলো না যে একজন খুনী আসামী মাত্র বাইগেমীর মত এক সামান্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কিনা রেহাই পেয়ে যাবে।

পডারজয়কে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হল। সে কিন্তু আদৌ ঘাবড়ালো না। বেশ হাসিখুশী ভাব। সে এসে পত্নী মার্গারেটকে কেব্‌ল করে জানালো—ভেবো না, অলৌকিক কিছু ঘটবেই।

১৯৩৫-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী সে বাইগেমির অভিযোগ স্বীকার করলো। পাঁচ বছর জেল হল তার। জেলে অপর এক আসামীর সঙ্গে মারপিটের মুখে সে একটি চোখ ও কয়েকটি দাঁত হারায়।

১৯৪০এর ১লা ফেব্রুয়ারী পডারজয় খালাস পায়। তারপর তাকে বেলগ্রেডে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে নাৎসীরা যখন যুগোশ্লাভিয়া দখল করে নেয় তখন খুব সম্ভবত তাদের খপ্পরে পড়ে সে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং প্রাণ হারায়।

তার নিরুদ্দিষ্ট হবার সঙ্গে অ্যাগনেস টাফভারসনের নিরুদ্দিষ্ট হবার রহস্যপূর্ণ কেসেরও সমাধিপ্রাপ্তি ঘটে।

সমাপ্ত